

শান্তা দেবী   সীতা দেবী

হিন্দুস্থানী উপকথা

হিন্দুস্থানী উপকথা

শান্তা দেবী
সীতা দেবী

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম 'মিত্র-ঘোষ' সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৮৩
তৃতীয় মুদ্রণ, মাঘ ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮

—কুড়ি টাকা—

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অঙ্কিত
বহুচিত্র সংবলিত

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

এই পুস্তকখানি এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু, বি-এ, বিদ্যার্ণব, প্রণীত Folk-tales of Hindusthan-এর অনুবাদ। পাণিনি কার্য্যালয়ের স্বত্বাধিকারিগণ উহা অনুবাদ করিবার অনুমতি দেওয়ায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গল্পগুলি ইংরেজীতে পড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মহাত্মা স্টেড্ সাহেব তৎসম্পাদিত Review of Reviews পত্রিকার ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই উপকথাগুলি আরব্যোপন্যাসের মত মনোহর।

॥ গল্পের সূচী ॥

হিন্দুস্থানী উপকথা



হঁশিয়ার খাঁর তিনটি কথা কিনিয়া কম-আক্কেল নিরাশ হইল।
[জঞ্জাল নগরীর কথা]



বালকগণ গণনা দ্বারা হুঁশিয়ার খাঁর বাড়ি বাহির করিল।
[জঞ্জাল নগরীর কথা]



"আমি 'কিছু' পেয়েছি গো, আমি 'কিছু'পেয়েছি।"

॥ জঞ্জাল নগরীর কথা ॥



"শেষ কালে একটা মই জিতলে ?"

॥ জঞ্জাল নগরীর কথা ॥

দুই বোকার কথা

একদিন দুই বন্ধু একটা রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। তাহারা কিছু দূর গিয়াছে, এমন সময় এক বুড়ী তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বুড়ী কাহাকে সেলাম করিয়াছে, এই লইয়া দুই বন্ধুতে ঝগড়া বাধিয়া গেল, এবং অনেক তর্কবিতর্কের পরেও যখন কিছুই ঠিক হইল না, তখন তাহারা ঝগড়ার মীমাংসার জন্য বৃদ্ধার নিকটে যাওয়াই স্থির করিল। তাহারা বৃদ্ধার পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওগো বাছা, তুমি একটু দাঁড়াও, আমাদের সন্দেহ দূর করে দাও।' সে তাহাদের চীৎকার শুনিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি ? তোমরা এত চীৎকার করছ কেন ?' দুই বন্ধু বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ গো বাছা, তুমি কাকে সেলাম করেছিলে ?' বৃদ্ধা উত্তর করিল, 'তোমাদের দুজনের মধ্যে যে বেশী বোকা আমি তাকেই সেলাম করেছিলাম।' দুজনেই তখন আপনাকে অধিক নির্ব্বোধ প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন বৃদ্ধা কহিল, 'শুধু তোমাদের কথার উপর নির্ভর করে তো আমি এমন সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারি না ; আচ্ছা, তোমরা দুজনেই বল যে তোমরা কে কি বোকামি করেছিলে, আমি তা'হলে মীমাংসা করতে পারব।' প্রথম ব্যক্তি তখন তাহার গল্প আরম্ভ করিল।

গ্রীষ্মকালে একদিন আমি একটা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমার যখন খুব গরম লাগতে লাগল, তখন আমি একটা কূয়োর ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠে দেখলাম যে, আমার পাগড়ীটা কূয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছে, আর আমার জুতো জোড়া হয় কুকুরে নয় চোরে নিয়ে পালিয়েছে। আমি তখন কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না যে, এখন আমি কিই বা করি, কেমন করেই বা বাড়ী ফিরে যাই। যা হোক, কোন রকমে সাহস করে আমি খালি পায়ে খালি মাথায়ই বাড়ীর দিকে ছুটলাম। মাথাটা কিন্তু হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম।* আমার ঝি আমাকে অমন অবস্থায় বাড়ী আসতে দেখে কাঁদতে কাঁদতে গিন্নির কাছে গিয়ে বলল, 'ওগো গিন্নিমা গো, না জানি কি সর্ব্বনাশ হয়েছে গো ; বাবু খালি পায়ে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বাড়ী ফিরে আসছেন।' আমার বাড়ীর লোকেরা যেই আমার আসার খবর পেল, অমনি সকলে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করল। আমি বাড়ী পৌঁছে দেখি সকলে মিলে কাঁদছে আর মাথার চুল ছিঁড়ছে। আমি যে এই অনর্থের মূল সে কথা আমার মনেই হ'ল না। আমি ভাবলাম আমাদের নিশ্চয়ই কোন একটা ভয়ানক বিপদ ঘটেছে ; কাজেই আমিও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, তাদের মধ্যে বসে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলাম। আমাদের চীৎকারের চোটে পাড়া-প্রতিবেশী সকলে ছুটে এল, আর তারাও দরদ দেখাবার জন্যে আমাদের কান্নায় যোগ দিল। প্রায় দু-তিন ঘণ্টা কাঁদবার পর, একজন প্রতিবেশী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, তোমাদের বাড়ী কে মরেছে ?' আমি বললাম, 'আমি তো কিছু জানি না। আমার বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা কর।' আমার কথা শুনে আমার

---

* পশ্চিমে খালি মাথায় বাহির হওয়া শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

ঝি বলে উঠল, 'সে কি বাবু? আমরা তো আপনাকে অমন পাগলের মতন বাড়ী ছুটে আসতে দেখেই কাঁদছিলাম।' তখন আমি নিজের জুতো ও পাগড়ীর কাহিনী সব বললাম। তাই শুনে সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী বোকা।'

প্রথম পথিকের গল্প শেষ হইল।

তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার বোকামির গল্প আরম্ভ করিল।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরেই শ্বশুর-বাড়ী হতে আমার নেমন্তন্ন এল। আমার বন্ধুরা সকলে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগল, 'দেখ্, সেখানে গিয়ে খুব সামলে চলিস। জামাই-মানুষকে বেশী খেতে-টেতে নেই, কিম্বা খিদে পেয়েছে তা লোককে জানতে দিতে নেই। খাবার সময় খুব সাবধান হয়ে থাকিস।' আমি তাদের পরামর্শ অনুসারে চলতে রাজি হলাম। শ্বশুর-বাড়ী পৌঁছে দেখি যে, আমার জন্যে খুব বিরাট আয়োজন হয়েছে। আমার সামনে থালা সাজিয়ে এত চমৎকার সব খাবার দিল যে, সেগুলো খাবার জন্যে আমার জিব দিয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শ-মত আমি কিছুই খেলাম না। আমার শাশুড়ী আমাকে খাওয়াবার জন্য জেদ করতে লাগলেন দেখে আমি বললাম, 'আমার ভারি পেট কামড়াচ্ছে, আমি কিছু খেতে পারব না।' সারাদিন এমনি করে উপবাস করে কাটালাম, কিন্তু রাত্রে আমার এত খিদে পেল যে, ইচ্ছে করছিল নিজের হাড়গুলোই চিবিয়ে খাই। খিদের জ্বালায় আর থাকতে না পেরে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে হাৎড়াতে হাৎড়াতে খাবারের সন্ধানে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথমে এ-ধার ও-ধার খুঁজেও কিছুই পেলাম না, শেষে দেখলাম এক কোণে অনেকগুলো ডিম রয়েছে। দু-হাত ভরে ডিম নিয়ে আমি নিজের শোবার ঘরের দিকে দৌড়লাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে শোবার ঘরের চৌকাঠে পা আটকে দড়াম করে এক আছাড় খেলাম। শব্দ শুনে বাড়ীর সকলে জেগে উঠে কি ব্যাপার তাই জানবার জন্যে ছুটে এল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ডিমগুলো লুকোবার সময় পেলাম না। পাছে কেউ আমার কীর্তি জানতে পারে, এই ভয়ে আমি সবগুলোকে মুখে পুরে দিলাম। মুখটা একেবারে তরমুজের মত ফুলে উঠল, আর আমার প্রায় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। বাড়ীর সকলে ঘরে ঢুকে দেখল যে, আমার মুখটা বেজায় ফুলেছে। সকলেই আমার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি কথা বলবার জন্য হাঁ করলেই তারা ডিমগুলো দেখতে পাবে, এই ভয়ে আমি উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। সবাই যখন দেখল যে আমি তাদের কথার উত্তরও দিচ্ছি না, হাতপাও নাড়ছি না, তখন আমার শাশুড়ী চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'আহা, বাছা আমার না খেয়েই মারা গেল! দেখ, তার মুখটা না খেয়ে আর ঠাণ্ডা লেগে কি রকম ফুলেছে! শীঘ্র হাকিম আনতে লোক পাঠাও।' একটু পরেই হাকিম এসে হাজির হলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, আমি কথা বলছি না, আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমার চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসছে, তখন তিনি বললেন যে, আমার একটা ভয়ানক রোগ হয়েছে, তার নাম 'গালফোলা', আর এখনি অস্ত্র না করলে আমার অসুখ কিছুতেই সারবে না। বলেই একটা ছুরি নিয়ে তিনি আমার গালে

বসিয়ে দিলেন। ছুরির খোঁচা লেগে গালের মধ্যেই একটা ডিম ভেঙে গেল, আর তার সাদা আর হলদে রসটা হড়-হড় করে গালের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে পড়তে লাগল। হাকিম তখন খুব গর্ব্ব করে বললেন, 'দেখ দেখি, গালে কত কি সব জমে ছিল!' এই বলে ছুরি নিয়ে আর একটা গালেও একটা মস্ত গর্ত্ত করে দিলেন। এবার দুটো ডিম ভেঙে তার সমস্ত রসটা বেরিয়ে এল। হাকিম বললেন, 'দেখ, কি-রকম পুঁজ বেরচ্ছে!' আমি তো রাগে আর যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে, সব ডিমগুলো মুখ থেকে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে বললাম, 'দূর হ বোকা হাকিম! পুঁজ না তোর মুণ্ডু! ও-সব ডিমের রস। এ দুটোর প্রভেদ বুঝতে পারিস না তুই এমনি বোকা?' আমি ভেবেছিলাম যে, এই কথা বলাতে হাকিম একেবারে চুপ হয়ে যাবে, কারণ সে বাস্তবিকই ভারি অহঙ্কারী আর বোকা ছিল। সে রোগীদের খুব তেতো ওষুধ দিত, আর যত লোককে সারাত, তার চেয়ে বেশী লোককে মেরে ফেলত। কিন্তু আমি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে, সবাই আমাকে বিদ্রূপ করে হাসতে লাগল, আর বলল, 'দুজনের মধ্যে তুমিই বেশী বোকা।'

বৃদ্ধা মন দিয়া দুইজনের কাহিনী শুনিল; পরে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, 'আমিও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে একমত। তোমার বন্ধু অসাধারণ বোকা বটে, কিন্তু তুমি তার চেয়েও বেশী বোকা। আমি তোমাকেই সেলাম করেছিলাম।'

দুই বন্ধু তখন সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিয়া গেল।

ব্রহ্মদৈত্য ও ঝগড়াটী বামনীর কথা

কোন গ্রামে এক বটগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। সে ধর্ম্মের জন্য পাগল হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। সেই বটগাছের নিকটেই একঘর ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহাদের উপর ব্রহ্মদৈত্যের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। সে ঐ ব্রাহ্মণবংশেরই লোক, সেই জন্য সে ঐ পরিবারের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করিতে ত্রুটি করিত না। সে সর্ব্বদাই উহাদের ঘরে ইট, পাথর, হাড়, গোবর, বিষ্ঠা ও নানা-প্রকার আবর্জ্জনা ছুঁড়িত এবং মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া ও ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া গৃহস্থদের ভয় দেখাইত। তাহার এইরূপ কৃপার গুণে শীঘ্রই উহাদের পরিবারের লোকসংখ্যা খুব কমিতে আরম্ভ করিল এবং টাকাকড়ির অবস্থাও খুব খারাপ হইয়া উঠিল। অধিকাংশ লোকই মরিয়া গেল। অবশেষে একজন আধপাগলা বোকা লোক ছাড়া ঐ বংশে পিণ্ড দিবার জন্য কেহই বাকী রহিল না। ব্রহ্মদৈত্য ঐ লোকটিকে অবজ্ঞা করিয়া আপনার কৃপা হইতে মুক্তি দিয়াছিল। শাস্ত্রে বলে যে, সকল মানুষেরই জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু হয়। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। লোকটি নিরেট বোকা হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য একত্র মিলিত হইলেন। অনেক বিবেচনার পর স্থির হইল যে, বোকার বিবাহ হওয়া একান্তই আবশ্যক, না হইলে গ্রামের লোকদের দুর্নাম

হইবে। একজন প্রতিবেশীর কন্যার সহিত উহার বিবাহও স্থির হইল। ঐ মেয়েটির বয়স চৌদ্দ বৎসর। সে এত ঝগড়াটী ছিল যে, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। শাস্ত্রে আছে যে, অবিবাহিত মানুষ আধখানা মানুষের সমান, এবং গৃহিণীহীন গৃহ মশানতুল্য। কাজেই পঞ্চায়তের হুকুম-মত সেই কন্যার সহিত বোকার বিবাহ হইয়া গেল। উহাদের বিবাহ দিয়াই প্রতিবেশীরা আপনাদিগকে কর্ত্তব্যমুক্ত মনে করিলেন। তাহাদের ঘরসংসার কেমন করিয়া চলিবে, তাহার কোন উপায় স্থির করিয়া দেওয়া তাঁহারা আবশ্যক মনে করিলেন না। অসহায় বোকা লোকটা এতকাল ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইত; এক্ষণে একটি পত্নী জোটাতে তাহার বোঝা বাড়িয়া উঠিল। সে এখন কি করিয়া দুইজনকে পুষিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সুশীলা পত্নী কিন্তু ঘরে ঢুকিয়াই তাহার গালে মস্ত এক চড় কসাইয়া দিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল ও রোজগারের চেষ্টা দেখিতে বলিল। বেচারা আগের নতন সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিল, কিন্তু বিবাহে গ্রামস্থ ভাইবেরাদরীকে ভোজ না দেওয়াতেই সকলেই তাহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই এখন তাহাকেই কেহ ভিক্ষা দিল না। সমস্ত দিন গ্রামে ঘুরিয়া সে সন্ধ্যাবেলা নিরাশ হৃদয়ে ও ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল। তাহার পত্নী তাহাকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, 'কি-রে লক্ষ্মীছাড়া বামুন, এতক্ষণে ফিরে এলি? সমস্ত দিন ধরে কি করছিলি? কি নিয়ে এসেছিস, দেখি?' বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া আপনার স্বামীর কাপড় তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিল; ব্রাহ্মণ কিছুই আনে নাই দেখিয়া সে ক্রোধে দিশাহারা হইয়া উঠিল। সে স্বামীর মাথা থেকে পাগড়ীটা কাড়িয়া লইয়া সেই ব্রহ্মদৈত্যের বটগাছের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল ও একটা পচা মুড়োঝাঁটা লইয়া তাহাকে উত্তমরূপে পিটাইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে বেচারা ব্রাহ্মণ রাগে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে ঘর ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। কিন্তু তাঁহার গৃহিণীর তখনও ক্রোধ-শান্তি হয় নাই। সে ঝাঁটাহাতে বটগাছের দিকে দৌড়িয়া গিয়া স্বামীর পাগড়ীটা নাগালের অনেক উপরে রহিয়াছে দেখিয়া, গাছের উপরেই অবিশ্রাম ঝাঁটা বসাইতে লাগিল। তাহার গালির চোটে ও ঝাঁটার ঘায়ে অবশেষে ব্রহ্মদৈত্যও ভয় পাইয়া তাহার অনেক শত বৎসরের আড্ডা সেই বটগাছটি ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে বোকা বামুন দৌড়াইতে দৌড়াইতে গ্রামের বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং স্থির করিল যে, পত্নী জীবিত থাকিতে আর গৃহে ফিরিবে না। সে যখন বিষণ্ণচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তখন ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে দেখিতে পাইল। সেও ঐ পথেই একটা ঘূর্ণি বাতাসের উপর চড়িয়া ব্রাহ্মণীর ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। দুঃখ সকলকেই ব্যথার ব্যথী করে। ব্রহ্মদৈত্য এতদিন অবজ্ঞা করিয়া বোকা বামুনের দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই, কিন্তু এখন সে সাধিয়াই তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'রাম-রাম ভাইয়া,* তুমি কি আমায় চিনতে পারছ? আমি তোমার প্রতিবেশী ভূত। আমিও তোমার ঝগড়াটী স্ত্রীর জ্বালায় পালিয়ে এসেছি; কাজেই এখন থেকে আমি তোমায় ভাইয়ের মতন দেখব।

* হিন্দুস্থানীরা "রাম রাম" বলিয়া পরস্পরকে নমস্কার করে।

তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও তার কাছে ফিরে যাবে না।’ এই অযাচিত সাহায্য পাইয়া বোকা বামুন অত্যন্ত খুসী হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল।

তাহারা চলিতে চলিতে অবশেষে একটা খুব বড় সহরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহরে ঢুকিবার আগে ব্রহ্মদৈত্য বামুনকে বলিল, ‘ভাই, আমি যা বলি তা ভাল করে শুনে রাখ। যদি আমার কথা শুনে চল, তা হলে খুব ধনী হতে পারবে। এই নগরে দুটি খুব সুন্দরী মেয়ে আছে; একজন রাজার মেয়ে, আর একজন উজিরের মেয়ে। আমি গিয়ে উজিরের মেয়ের ঘাড়ে চড়ব। উজির অনেক রকমের চিকিৎসা করাবেন, কিন্তু আমি তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি পথে পথে ফকিরের বেশ ধরে ঘুরে বেড়িও; উজির যখন তোমার কাছে এসে তাঁর মেয়েকে সারাতে বলবেন, তখন তুমি যত ইচ্ছা টাকা চেও। আমি তোমাকে দেখলেই মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যাব। তারপর আমি গিয়ে রাজকন্যার ঘাড়ে চড়ব। কিন্তু খবরদার তুমি যেন সেখানে যেও না; আমি তাকে ভালবাসি। তাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না। তুমি যদি সেখানে যাও তা হলে আমি তখুনি তোমার ঘাড় মটকে দেব।’ এই বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য প্রস্থান করিল। বোকা বামুন একাকী নগরে প্রবেশ করিয়া নগরের সীমানায় একটি ছোট সরাইয়ে আশ্রয় লইল।

তাহার পরদিন সমস্ত নগরে প্রচারিত হইয়া গেল যে, উজিরের সুন্দরী কন্যার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। সকলেই এই সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। সব রকমের ডাক্তার হাকিম ও কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করিতে আসিল, কিন্তু সকলেই তাহাকে দেখিয়া বলিল যে, আরোগ্যের কোন আশা নাই। উজির তাঁহার একমাত্র কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া শোকে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন, এবং নগরে প্রচার করিয়া দিলেন, যে-কেহ তাঁহার কন্যাকে নীরোগ করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দান করিবেন। এদিকে বোকা বামুন সারা অঙ্গে ছাই ও কাদা মাখিয়া পথে পথে ‘বোম, বোম ভোলানাথ’ বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরের লোকেরা তাহার ভাবভঙ্গী ও চালচলন দেখিয়া তাহাকে একজন অতি সাধুপুরুষ ভাবিয়া উজিরের নিকটে গিয়া তাহার কথা বলিল। উজির আপনার অনুচর পারিষদ লইয়া তৎক্ষণাৎ বামুনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে প্রণাম করিয়া অতিশয় বিনীতভাবে তাঁহার কন্যাকে আরোগ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে অতিশয় অনিচ্ছার ভান করিল; অবশেষে উজিরের অনেক সাধ্যসাধনায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার গৃহে যাত্রা করিল। উজিরের কন্যাকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল। ভূতে-পাওয়া মেয়েটি রুক্ষ কেশে ও ছিন্ন মলিন বেশে চীৎকার করিতে করিতে ও আপনার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল,

‘ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা,
ছু-মন্তর, সব নিকল্ যানা,
মানো মানো শিবকা কহনা।’

(ভূত, প্রেত, পিশাচ ও দৈত্যগণ, তোমরা এই মন্ত্র শুনিয়া সকলে প্রস্থান কর।

শিবের আজ্ঞা পালন কর।)

এইরূপে চীৎকার করিয়া সে অনেক অর্থহীন মন্ত্র বলিয়া গেল। অবশেষে ব্রহ্মদৈত্য অতিশয় ভীত হইবার ভান করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, আমি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি।' বোকা বামুন তখন দস্তুরমত ব্রহ্মদৈত্যকে তাহার প্রস্থানের কোন চিহ্ন দেখাইতে বলিল। সে উত্তর করিল, 'ঐ গাছটা পড়ে গেছে দেখলেই বুঝবে যে আমি উজির-কন্যাকে ত্যাগ করেছি। এই আমার চিহ্ন।' এই বলিয়া ভূত মেয়েটিকে ত্যাগ করিয়া ও গাছ উপড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিল; অল্পক্ষণের মধ্যেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংবাদ নগর-মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল, এবং নগরবাসিগণের চক্ষে বোকা বামুন এখন ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। উজির আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন। তিনি বোকা বামুনকে আপনার ধনের অর্দ্ধেক দিলেন। সে তাহা লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যাকে আশ্রয় করিল। তিনি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণের খ্যাতি রাজবাড়ীতেও পৌঁছিয়াছিল। কাজেই তাহাকে আনিবার জন্য তখনই রাজদূত পাঠান হইল। কিন্তু নির্ব্বোধ কিছুতেই আসিতে রাজি হইল না, ব্রহ্মদৈত্যের কথা তাঁহার মনে ছিল। টাকা, মান, সম্ভ্রম, বড় বড় উপাধি, কত কি লোভ তাহাকে দেখান হইল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মন টলিল না। অবশেষে রাজা ভয়ানক রাগিয়া আপনার জল্লাদকে হুকুম দিলেন যে, ব্রাহ্মণ না আসিতে চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবে। ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া ভয় পাইয়া রাজবাড়ীতে আসিল, ও কেমন করিয়া আপনাকে ব্রহ্মদৈত্যের রোষ হইতে রক্ষা করিবে তাহাই ভাবিতে লাগিল। ব্রহ্মদৈত্য তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া কহিল, 'বোকা বামুন, তুই কেন নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এখানে এলি? তোর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, নরকের দরজা তোর জন্যে খোলা রয়েছে। দাঁড়া, এখনি তোর ঘাড় মটকাচ্ছি।'

ব্রাহ্মণ বলিল, 'ভাই ভূত, আমি তোমাকে জ্বালাতন করতে আসিনি, তোমাকে একটা ভয়ানক খবর দিতে এসেছি। সেটা সকল লোকের সামনে বলা যায় না, আমি তোমার কানে-কানে বলছি।'

এই বলিয়া সে রাজকন্যার নিকটে গিয়া তাঁহার কানে-কানে কহিল, 'হায়, ভাই ভূত, তুমি আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার অভিভাবক; তোমার অনুগ্রহের ছায়ায় কতকাল ধরে আমার বংশের লোকেরা বাস করেছে, আর তোমার দয়াতেই আমার এত টাকাকড়ি হয়েছে; কিন্তু হায়, হায়, এমন সুখের জায়গা আমাদের ছেড়ে যেতে হবে। কারণ সে আসছে। সেই ঝগড়াটী আসছে। এখনও রাজপ্রাসাদের বাইরে আছে; এই এসে পড়ল বলে।'

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার কথা শুনিয়াই ব্রহ্মদৈত্য প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে বাবারে, সে এখানেও এসেছে? আমি এক্ষুনি পালাচ্ছি।'

বলিয়াই সে রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তাহার পলায়নের বেগে দরজা জানালা সব ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পর নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল ও রাজার মৃত্যুর পর সে তাঁহার রাজ্য লাভ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

বেনে ও জাট চাষার কথা

একটি ছোট গ্রামে এক বেনে বাস করিত। তাহার চাল, ডাল, তেল, নুন প্রভৃতির একটি দোকান ছিল। সেই দোকানখানি গ্রামের লোকদের দরকারী ছোটখাট সব জিনিষ জোগাইত। একদিন দোকানের জিনিষপত্র কিনিবার জন্য সহরে যাইবার পথে সে এক গরীব জাট চাষাকে দেখিল। সেই কৃষকও মহাজনের ঋণ শোধ করিবার জন্য, সহরে যাইতেছিল। এই কৃষকের প্রপিতামহ তাহার নিজের প্রপিতামহের শ্রাদ্ধের জন্য এই ঋণ করিয়াছিল। মূল ঋণ মাত্র একশত টাকা ছিল, কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ যোগ হইতে হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহা এখন দশগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেচারা কৃষক যখন মহাজনের কবল হইতে পৈতৃক জমিগুলি রক্ষা করিবার উপায় ভাবিয়া অস্থির হইতেছিল, সেই সময় বেনে আসিয়া বলিল, 'কি হে চৌধুরীভায়া, তুমি দেখছি মহাজনের টাকা শোধ করতে চলেছ। জমিগুলো রক্ষা করবার কি কোনও উপায় নেই ?'

বেচারা কৃষক বলিল, 'হায় শাহজি, সে দুঃখের কথা আর বোলো না। তুমি তো জানই আমার প্রপিতামহ একশ' টাকা ধার করেছিলেন। এখন তাই হাজার টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; আমার এই ক'বিঘা মাত্র জমি দিয়ে কি করে এ ধার শোধ করব বল দেখি ?'

'দুঃখ কোরো না চৌধুরীভায়া, যার কপালে যা আছে তা ঘটবেই ঘটবে। নিজের দুর্ভাগ্যের জন্যে কেঁদে-কেটে আর কি হবে ? তার চেয়ে এস বরঞ্চ গল্প বলতে বলতে পথের কষ্টটা দূর করা যাক।'

'বেশ বলেছ শাহজি, তোমার কথাই ঠিক। ভাগ্যে যা আছে তার জন্য কেঁদে কোনও লাভ নেই। এস, গল্প বলতে বলতে যাওয়া যাক ; তা হলে আর পথ চলার কষ্ট বোঝা যাবে না। কিন্তু একটা সর্ত্ত করতে হবে। যতই কেন মিথ্যা আজগুবি গল্প হোক কেউ তাকে মিথ্যা কিম্বা মনগড়া বলতে পাবে না। যে সর্ত্ত ভাঙবে, তাকে হাজার টাকা দিতে হবে।

বেনে বলিল, 'আচ্ছা তাই হবে ; আমি এখন গল্প আরম্ভ করি।' এই বলিয়া সে গল্প আরম্ভ করিল।

'তুমি বোধ হয় জান, বেনেদের মধ্যে আমার প্রপিতামহ আর সকলের চেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন, আর খুব ধনীও ছিলেন।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'আমার এই পূর্ব্বপুরুষ মহাশয় একবার চল্লিশখানা জাহাজ সাজিয়ে চীন দেশে যাত্রা করেছিলেন, আর সেখানে হীরা-জহরতের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'তার পর সে-দেশে অনেককাল কাটিয়ে অনেক টাকাকড়ি জমিয়ে, তিনি নানা-রকম আশ্চর্য্য

জিনিস নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। তার মধ্যে একটি খাঁটি সোনার মূর্ত্তি ছিল। সে কথা বলতে পারত, আর যে-কোনও কথার উত্তর দিতে পারত।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'তার পরে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন, কত লোক নিজেদের ভাগ্যে কি আছে শোনবার জন্যে সেই মূর্ত্তির কাছে আসতে লাগল, আর তার উত্তর শুনে খুসী হয়ে ফিরে যেতে লাগল। একদিন তোমার প্রপিতামহ আমার পিতামহের বাড়ী সেই মূর্ত্তির উত্তর শুনতে এলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান কোন্ জাত?" সে বলল, "বেনে জাত।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "সকলের চেয়ে বোকা কোন্ জাত?" সে বলল, "জাট।" সকলের শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, বল তো আমার বংশে সকলের চেয়ে বোকা কে হবে?" মূর্ত্তি বলল, "চৌধুরী লহরী সিং।"

লহরী সিং কে জান? যে কৃষকের কথা আমরা বলিতেছি সে-ই লহরী সিং। বেনের কথায় যদিও তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল তবুও সে বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।' কিন্তু সে মনে মনে বেনের কথার শোধ তুলিতে পণ করিল। এমন শোধ তুলিবে যে ইহজন্মে বেনে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না।

বেনে আবার আরম্ভ করিল।

'সেই মূর্ত্তির যশ চারিদিকে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। রাজা সেই কথা শুনে আমার প্রপিতামহকে ডেকে পাঠালেন আর এই মূর্ত্তিটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে মূল্যস্বরূপ তাঁকে প্রধান মন্ত্রী করলেন।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'তারপর তিনি অনেক দিন রাজার বিশ্বস্তমন্ত্রী থেকে তাঁকে মন্ত্রণা দিতেন। শেষে যখন তিনি মারা গেলেন, আমার ঠাকুরদাদা তাঁর পদ পেলেন। তিনিও খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতেন, কিন্তু রাজার মনের মতন করে কাজকর্ম্মে মন দিতেন না। কাজেই রাজা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর উপর চটে গেলেন আর তাঁকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলতে হুকুম দিলেন। তখন তাঁকে একটা পাগলা হাতীর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল; কিন্তু হাতীটা তাঁকে দেখে বেশ শান্তশিষ্টের মতন মাথা নীচু করে শুঁড় দিয়ে তাঁকে পিঠের উপর তুলে নিল।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'রাজা যখন দেখলেন যে হাতীটা আমার ঠাকুরদাদাকে মারল না, তখন তিনি আর কি করেন? ঠাকুরদাদাকে আবার তাঁর পদ দিয়ে তাঁকে খুব আদর অভ্যর্থনা করলেন। ঠাকুরদাদা মারা গেলে বাবা মন্ত্রী হলেন। কিন্তু বাবার নানা দেশ দেখবার বড় সখ ছিল। তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে ভ্রমণে বাহির হলেন। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে তিনি কত আশ্চর্য্য রকমের জিনিস দেখলেন; কোথাও কতকগুলো একপেয়ে লোক মাথা নীচু করে গাছের ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে, কোথাও একচক্ষু রাক্ষস, কোথাও বা দৈত্য-দানব;





উপরে
হাকিম বোকা জামাইয়ের গাল
চিরিয়া দিতেছেন
(দুই বোকার কথা)

নীচে
ঝগড়াটী বামনী বামুনকে ঝাঁটা
মারিয়া তাড়াইতেছে।
[ব্রহ্মদৈত্য ও ঝগড়াটী বামনীর কথা]



মশার পেটের ভিতর চাষার বাবা ও বেনের বাবার যুদ্ধ।
[বেনে ও জাট চাষার কথা]



চাষার প্রপিতামহ গ্রাম মাথায় করিয়া পৃথিবীময় বৃষ্টি ধরিয়া বেড়াইতেছেন। [বেনে ও জাট চাষার কথা]

এই রকম কত কিছুই না দেখলেন। এক দিন আমার বাবা দেখলেন যে একটা মশা তাঁকে কামড়াবার জন্য কানের কাছে ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছে। কি করবেন ভেবে না পেয়ে বাবা মহা মুস্কিলে পড়লেন। জানই তো আমাদের বেনে জাতের জীবহত্যা করতে নেই!'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'কাজেই মহা বিপদে পড়ে বাবা হাঁটু গেড়ে বসে মশার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। অত সাধাসাধি করাতে মশা বললে, "শাহজি, আপনার মতন মহৎ লোক আমি আর কখনও দেখিনি। আমি আপনার একটা মস্ত উপকার করব।" এই বলে সে প্রকাণ্ড এক হাঁ করল। বাবা তার মধ্যে আগুনের মতন জ্বলজ্বলে সোনার মস্ত এক প্রাসাদ দেখতে পেলেন। তার কত হাজার হাজার জানালা, কত শত শত দরজা। সেই জানালার একটির ধারে এক পরমা সুন্দরী কন্যা দাঁড়িয়ে আছেন। প্রাসাদের দরজার কাছে একটা চাষা সেই রাজকন্যাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল। আমার বাবা প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন ও স্ত্রীলোকের মান-ইজ্জত রক্ষা করতে জানতেন। তিনি এক লাফে মশার মুখে ঢুকে একেবারে তার পেটের মধ্যে চলে গেলেন। সেখানে কি ভীষণ অন্ধকার! তিনি মশার পেটের ভিতর হাৎড়ে বেড়াতে আরম্ভ করলেন।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

'কিছুক্ষণ পরে অল্প অল্প করে অন্ধকার দূর হয়ে গেল। বাবা আবার সেই প্রাসাদ, সেই রাজকন্যা, সেই চাষা, সব দেখতে পেলেন। আমার বাবা খুব সাহসী ছিলেন। তিনি গিয়ে সেই চাষাটার ঘাড়ে পড়লেন, সে-লোকটা হচ্ছে তোমার বাবা। এক বৎসর ধরে তাঁরা সেই মশার পেটের মধ্যে লড়াই করতে লাগলেন। তারপর তোমার বাবা হার মেনে রাজকন্যার দাবি ছেড়ে দিলেন। আমার বাবা তখন সেই কন্যাকে বিবাহ করে প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে সেইখানে আমার জন্ম হল। তোমার বাবা আমার বাবার দরওয়ান হয়ে সমস্ত দিনরাত দরজায় পাহারা দিতেন। আমি যখন পনরো বৎসরের তখন একদিন খুব ঝম্‌ঝম্ করে ফুটন্ত জল বৃষ্টি হয়ে আমাদের বাড়ী ঘর সব গলে গেল। আমরা এক জ্বলন্ত সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে আমার মা বাবা, তোমার বাবা আর আমি, এই চারজনে গিয়ে তীরে পৌঁছলাম। আমরা এক লাফে গিয়ে তীরে হাজির হলাম। ওমা! গিয়ে দেখি কার এক রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, রাঁধুনী তো আমাদের দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে যখন সে দেখলে যে আমরা ভূত নই, মানুষই, তখন তার কথা ফুটল। সে বলল, "তোমরা তো বেশ লোক দেখছি! আমার ঝোল-টোল সব মাটি করে দিলে। আমি মাছ রাঁধব বলে জল চড়িয়ে ছিলাম। তোমাদের তার মধ্যে ঢোকবার কি দরকার ছিল? বাবা, এমন করেও লোককে ভয় দেখাতে হয়!" আমরা আমতা-আমতা করতে লাগলাম, বললাম, "আমরা না জেনে এসেছি, আমরা কিছুই জানতাম না,—এই পনরো বৎসর ধরে আমরা এক মশার পেটের ভিতর প্রকাণ্ড এক রাজবাড়ীতে আছি।" রাঁধুনী বলল, "ওহো, বুঝেছি বুঝেছি, এই পনরো মিনিট আগে একটা মশা আমার হাতে কামড়াচ্ছিল; এই দেখ না

এইখানটা ফুলে উঠেছে। মশাটা বোধ হয় তোমাদের শুদ্ধ আমার হাতে হুল বিঁধিয়ে দিয়েছিল। বাবা, যে রকম লেগেছিল! আমি বিষটা টিপে বের করবামাত্র সরষের মতন ছোট্ট কালো একটা কি দেখলাম, সেটা আবার কপালগুণে এই গরম জলে পড়ে গেল; আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তোমরা তার ভিতরে ছিলে।” বাবা বললেন, “বামুনঠাকরুণ, আমরা কি করে তোমার রান্নার মধ্যে এসে পড়েছি তা তো এখন বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। তুমি যে পনরো মিনিটের কথা বলছ, সেই বোধ হয় আমাদের পনরো বৎসর।” আসল কথা, যদিও আমি দেখতে পনরো বৎসরের ছেলের মতন ছিলাম, তা হলেও আমার বয়স মাত্র পনরো মিনিট। আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম যে মাত্র পনরো মিনিটে কি করে এত কাণ্ড হ'ল, আমি এত বড় হলাম, আর আমার মা বাবার বয়স পনরো বৎসর বেড়ে গেল। এখন যদিও আমি পঁচিশ বৎসরের জোয়ানের মত দেখতে, কিন্তু আমি একটা দশ বৎসরের ছেলে মাত্র, মশার আগুনের মত গরম পেটে পনরো মিনিট ছিলাম বলেই এখন আমি এমন অদ্ভুত রকম বেড়ে উঠেছি।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক।'

বণিক বলিল, 'বাইরে এসে দেখলাম যে আমরা আর-এক রাজ্যে এসে পড়েছি। আসলে আমরা এই গ্রামে এসে পড়লাম। কাজেই আমার বাবা যদিও আগে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, শেষে দোকান করতে আরম্ভ করলেন আর আমি তাঁর সাহায্য করতে লাগলাম। আর আমার রাজকন্যা মা যে সেদিন স্বর্গে গেলেন তা তো তুমি জানই। এই আমার গল্প।'

কৃষক বলিল, 'হাঁ হাঁ, শাহজি, ঠিক ঠিক। তোমার গল্পটা, ভাই, একেবারে খাঁটি। আমার গল্পটাও যদিও খাঁটি সত্য, কিন্তু তোমার মতন আশ্চর্য্য নয়। তা হলেও আমার গল্পের প্রত্যেকটি কথা সত্য। এখন মন দিয়ে শোন।'

'আমার প্রপিতামহ গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় চাষী ছিলেন। তাঁর জমকালো চেহারা, ভদ্র ব্যবহার আর গভীর জ্ঞান দেখে সকলেই তাঁর প্রশংসা করত। সমাজের সকলে তাঁকে মান্য করে চলত। তিনি গ্রামের মোড়ল ছিলেন বলে দুর্ব্বলেরা তাঁর আশ্রয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাত। গ্রামের যত মজলিসে তাঁকেই ভাল আসনটা দেওয়া হ'ত। আর হুঁকোটা সবার আগে তাঁরই হাতে দেওয়া হ'ত। তাঁর গুণের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত। কোন গরীব-দুঃখীকে কষ্টে পড়তে দেখলে তিনি যথাসাধ্য তার সাহায্য করতেন; চাষের জন্য অন্য লোককে বিনা ওজরে নিজের বলদ-জোড়া ধার দিতেন; অন্য চাষীর ধান কাটবার লোক কম পড়লে নিজের লোকদের পাঠিয়ে দিতেন, আর গ্রামের দশজনকে তিনি নিজের ইচ্ছায় ক্ষেতের ফসলের আর গোয়ালের দুধ-ঘির ভাগ দিতেন। গ্রামের লোকের ঝগড়া হলে তিনিই মিটিয়ে দিতেন, তাঁর কাজে কোন লোকেই বাধা দিত না। এক কথায় বলতে গেলে, রাজার হুকুম কিম্বা কাজির বিচারের থেকেও তাঁর কথার বেশী জোর ছিল। দুষ্ট লোকে তাঁর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকত; তাঁর গায়ে রুস্তম কি ভীমের চেয়েও বেশী জোর ছিল বলে কোন লোকে অন্যায় কিছু করে তাঁর কুদৃষ্টিতে

পড়তে সাহস করত না।'

বণিক বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'তার পর একবার আমাদের গ্রামে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হল। আমাদের অঞ্চলে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ল না, নদী পুকুর সব শুকিয়ে গেল, গাছপালা মরে গেল। গরু বাছুর না খেতে পেয়ে মরবার জোগাড় হ'ল, আর চারিদিকে হাজার হাজার জীবজন্তু মরতে লাগল। যখন আমার প্রপিতামহ দেখলেন যে তাঁর ভাঁড়ার প্রায় শেষ হয়ে এল, এখন আর কোন উপায় না দেখলে সমস্ত জনমানব না খেতে পেয়ে মরবে, তখন তিনি সমস্ত চাষাদের ডেকে জড় করে বললেন, "ভাই চাষীরা, ইন্দ্রদেব নিশ্চয়ই আমাদের উপর রাগ করেছেন, তা না হলে এতদিন কখনই অনাবৃষ্টি থাকত না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, যদি এর কোন উপায় না করা হয় তা হলে আমাদের সকলকেই না খেতে পেয়ে মরতে হবে। যদি তোমরা আমার পরামর্শ শোন তা হলে যতদিন দুর্ভিক্ষ থাকবে ততদিন আমি তোমাদের খাবার জোগাড় করে দেব। এখন তোমরা যদি ছ'মাসের জন্যে তোমাদের জমিগুলা আমার হাতে ছেড়ে দাও তা হলেই হয়। আমি তাতে সব ফসল ফলাব।" সকলেই তাঁর কথাতে রাজি হ'ল। তখন তিনি খুব কষে কোমর বেঁধে একটানে সেই হাজার বিঘা জমি-সুদ্ধ সমস্ত গ্রামটা তুলে মাথায় করে নিলেন।'

বেনে এই সব আজগুবি কথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল, কিন্তু মুখে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী ঠিক ঠিক।'

'তার পর সেই সমস্ত গ্রামটা মাথায় করে নিয়ে তিনি বৃষ্টির সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। যে দেশেই বৃষ্টির সন্ধান পেতেন তিনি সেই দেশেই গিয়ে উপস্থিত হতেন। এই রকম করে সমস্ত জমি বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নিয়ে আর সমস্ত পুকুর ডোবা জলে ভরে নিয়ে তিনি চাষাদের চাষ করতে আজ্ঞা করলেন। এমনি করে ছ'মাস ধরে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি সমস্ত মেঘের জল নিজের গ্রামে সংগ্রহ করে নিলেন। সেই সময়ে চাষীরা খুব চাষ করলে। সেবারকার মতন শস্য আমাদের দেশে আর কখনও হয়নি। গমের শীষ জল পেয়ে এমন বাড়তে লাগল যে শেষে গিয়ে আকাশে ঠেকল।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'আমার প্রপিতামহ গ্রামটা মাথায় করে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসে আবার যেখানকার গ্রাম সেইখানেই তাকে বসিয়ে দিলেন। সেবারে তাঁর খুব লাভ হ'ল, সমস্ত গ্রামটাই তখন তাঁর। গম, ভুট্টা সবই সেবার আশ্চর্য্য রকম বেড়েছিল। এক একটা দানা তোমার মাথার সমান।'

বণিক বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'তার পর সমস্ত গম জড় করে এত বেশী হ'ল যে, রাখবার জায়গা করাই মুস্কিল হ'ল। নানা দেশ থেকে লোকে এই আশ্চর্য্য ফসলের কথা শুনে শস্য কিনতে আমাদের গ্রামে এল। শস্য বিক্রী করে আমার প্রপিতামহ খুব লাভ করলেন। তিনি হাজার হাজার টাকা দরিদ্রদের দান করে দিলেন। কত লোককে বিনা মূল্যে গম দিলেন ; আর যারা টাকা দিতে পারে তাদের কাছে হক দরে বিক্রী করলেন।'

কৃষকের গল্প যখন এতটা বলা হইয়াছে, তখন তাহারা সহরে প্রবেশ করিল। কৃষক বলিতে লাগিল, 'সেই সময় তোমার প্রপিতামহ বেজায় গরীব ছিলেন। সেই জন্য আমার প্রপিতামহ তাঁকে শস্য ওজন করবার জন্যে চাকর রাখলেন।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'বেচারা সমস্ত দিন রাত গম ওজন করতেন, কিন্তু এমন বোকা ছিলেন যে বিক্রীর হিসাবে ক্রমাগতই ভুল করতেন; সেই জন্যে তিনি মনিবের কাছে প্রায়ই মার খেতেন।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

ঠিক সেই সময়ে তাহারা জাট চাষার মহাজনের দোকানে প্রবেশ করিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা 'রাম, রাম' বলিয়া নমস্কার করিয়া মেজেতে বসিল। কৃষক মহাজনকে কিছু না বলিয়া গল্প বলিয়া চলিল—

'তারপর যখন সব শস্য বিক্রী হয়ে গেল, তখন তোমার প্রপিতামহকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি যাবার সময় আমার প্রপিতামহের কাছে একশ' টাকা ধার চাইলেন। তিনি দয়া করে টাকা দিলেন।

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

তখন কৃষক খুব উচ্চৈঃস্বরে মহাজনকেও শুনাইয়া বলিল, 'কিন্তু তোমার প্রপিতামহ সে ধার শোধ করেন নাই।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'তার পর তোমার ঠাকুরদাদা, বাবা, এমন কি তুমিও, সে টাকা আজ পর্যন্ত শোধ কর নাই।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

কৃষক বলিল, 'সেই টাকা এখন সুদে আসলে এক হাজার টাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমার কাছে এই হাজার টাকা ধার।'

বেনে বলিল, 'হাঁ হাঁ, চৌধুরী, ঠিক ঠিক।'

'তুমি মহাজনের সামনে একথা স্বীকার করলে, এখন টাকাটা তাঁকে দিয়ে দাও। তা হলে আমার জমিটা খালাস হয়ে যায়।'

বেনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে ঋণ স্বীকার করিয়া উভয় সঙ্কটে পড়িল। যদি ইহাকে গল্প বলিয়া টাকা দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদের গল্প বলার সেই সর্ত্ত অনুসারে এক হাজার টাকা দিতে হয়; সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে নিজ কথামত ঋণ শোধ করিতে হয়। কাজেই যে কোন প্রকারেই হউক না কেন তাহাকে এক হাজার টাকা দিতে হইল, আর সমস্ত জীবন নিজের বেকুবীর জন্য আপসোস করিতে হইল।

জঞ্জালনগরীর কথা

'অন্ধের-খতা' নামে এক দেশ ছিল। সেখানে জঞ্জালনগরী নামে এক সহর ছিল। সেই দেশের লোকেরা এমন পণ্ডিত ছিল যে, দেশবিদেশে তাহাদের আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের কথা প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সে দেশের শিশুরা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস আর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সব জানিত। তাহারা জ্যোতিষীদের যন্ত্র লইয়া খেলা করিত। সে দেশের লোকেরা আইন পড়িতে এবং দার্শনিক প্রশ্নের চুলচেরা মীমাংসা করিতে খুব ভালবাসিত। বিদেশীরা সে দেশ থেকে ফিরিয়া আসিলে খুব বেশী বিজ্ঞ হইয়া আসিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু গরীবও হইয়া আসিত। অনেক লোককে সে দেশ থেকে আর ফিরিতে দেখা যাইত না। জঞ্জালনগরীর অধিবাসীরা মায়াবী বলিয়া প্রবাদ ছিল। লোকেরা বলিত তাহারা অজ্ঞ বিদেশীদের ছাগল, ভেড়া বা গরু বানাইয়া রাখিত। বাস্তবিক কিন্তু কথাটা সত্য নয়, তাহারা জ্ঞানী ছিল বলিয়া অন্য লোকে এইরূপ রটনা করিত। তাহারা যুক্তিতর্কে খুব পটু ছিল বটে, কিন্তু মোটের উপর নিতান্ত সাদাসিধা লোক ছিল ; তাহাদের সংসার-জ্ঞান একেবারেই ছিল না। এই সব অদ্ভুত প্রবাদের জন্য বাহিরের লোকেরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে সাহস পাইত না : কাজেই পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কোন রকম চিন্তার আদান-প্রদান তাহাদের হইত না।

একবার কম-আক্কেল নামে এক ধনী বণিক ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে এই সহরে প্রবেশ করিয়া সহরের চকে উপস্থিত হইল। সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়। পৌঁছিয়াই দেখে একজন গলা উঁচু করিয়া চীৎকার করিতেছে, 'তিন হাজার টাকায় তিনটি কথা ; খুব সস্তা যাচ্ছে, কে নেবে নাও। আমার নাম হুশিয়ার খাঁ, আমি সব রকমের প্রবাদ, পরামর্শ ও ভাল ভাল কথা বিক্রী করি।' এই আশ্চর্য্য রকম বিজ্ঞাপন শুনিয়া বণিক অত্যন্ত বিস্মিত হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিল এত অধিক মূল্যের তিনটি কথা কি হইতে পারে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর বণিকের কথা কিনিবার সাধ হইল। সে হুশিয়ার খাঁর নিকটে হাজির হইয়া তাহাকে তিন থলি মোহর দিয়া বলিল, 'মহাশয়, এই নিন টাকা ; আমায় কথাগুলি দিন।' হুশিয়ার থলি তুলিয়া লইয়া মোহরগুলি গুণিয়া ফেলিল, তারপর বণিককে একধারে লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'রাঁধুনীকে বিশ্বাস করিও না ; বন্ধুকে বিশ্বাস করিও না ; পরমেশ্বরে বিশ্বাস রাখিও।' বণিক মনে করিল, টাকাগুলি জলে ফেলিলাম ; নিরাশায় তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। হুশিয়ার বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'ভাই বণিক, লোককে ছলনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি নিজের জীবনেই আমার কথার মূল্য বুঝতে পারবে, তখন আবার আমাকেই ধন্যবাদ দেবে। যা হোক, তুমি যখন মনে করছ যে আমি তোমায় ঠকিয়েছি তখন আমি আরও কিছু দিচ্ছি। এই আম, খেজুর, পেয়ারা, কমলালেবু, ডালিম, তরমুজ, আঙুরের বিচি নিয়ে যাও, পুঁতলেই গাছ হবে আর তাতে পাকা পাকা ফল ধরবে ; "উড়ে যা" বললেই আর দেখা যাবে না, তখন আবার তুমি বিচিগুলি ফিরে পাবে।' বণিক তো এই সব

আশ্চর্য্য বীজ পাইয়া মহা আনন্দিত হইল ; ভাবিল মোহরের থলি বৃথা যায় নাই।

গৃহে ফিরিয়াই সে সর্ব্বাগ্রে রাঁধুনীকে এই আশ্চর্য্য জিনিসগুলি দেখাইল। বাড়ীর উঠানে বীজ পোঁতা হইল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই মস্ত মস্ত গাছ ও লতা গজাইয়া উঠিল, তাহার ডালে ডালে ফল। বণিক ও তাহার রাঁধুনী মনের সাধে খাইয়া পাড়াপ্রতিবাসীকে বিলাইল। তারপর 'উড়ে যা' বলিবামাত্র গাছগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল, বণিক বীজগুলি কুড়াইয়া লইল। রাঁধুনীটা ছিল ভারি দুষ্ট, সে 'কম-ইখলাক' (হীনধর্ম্ম) নামক কম-আক্কেলের এক প্রিয় বন্ধুর সহিত চোরাই মালের ব্যবসা করিত। একদিন বণিক বাড়ী ছিল না, রাঁধুনী সেই অবসরে তাহার অংশীদারকে ডাকিয়া পাঠাইল। দুই জনের দেখা হইলে রাঁধুনী বলিল, 'শোন ভাই, এখন কি করা যায় বল দেখি। আমার মনিব তো এই বিচিগুলো পেয়ে অবধি সব ছেড়ে দিয়েছেন, ঘর থেকে আর বেরোবার নামটি নেই। তিনি বাড়ী বসে থাকলে তো আমাদের টাকা পয়সা করাই মুস্কিল। জানই তো আমি কত কষ্টে ওকে জঞ্জালনগরীতে পাঠিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম ওখানে কেউ ভেড়া বানিয়ে রেখে দেবে ; তা এমনি আমাদের কপাল যে আপদটা আবার আমাদের সুখের পথে কাঁটা দিতে এল ; তার উপর এখন আবার আমায় খুব সন্দেহ করে, আর সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখে, আমি ওর হাত থেকে উদ্ধার পেতে চাই। এখন তুমি যদি কিছু সাহায্য কর, তবেই হয়।' অংশীদার রাঁধুনীর কথায় রাজি হইলে সে তাহার সব ফন্দি বলিল ; বন্ধুও শুনিয়া খুব খুসী হইল।

কম-আক্কেল বাড়ী আসিয়া দেখিল বন্ধু তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সে বেচারী তো বন্ধুকে দেখিয়া মহাখুসী। দুই বন্ধুতে এক সঙ্গে আহার করিতে বসিল। খাওয়ার পরে কম-ইখলাক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা ভাই, লোকে যে তোমার আশ্চর্য্য বিচির কথা বলে সে কি সত্যি ? সত্যিই কি এক মিনিটে গাছ হয় ? যদিও তুমি আমায় এই সব গাছের ফল পাঠিয়েছিলে বটে, কিন্তু আমি এমন অস্বাভাবিক কথা একটুও বিশ্বাস করতে পারিনি।' অল্পবুদ্ধি বণিকের নিজের বুদ্ধির উপরও যত দৃঢ় বিশ্বাস, বিচির উপরও তত বিশ্বাস। সে বলিল, 'কি, তুমি কি মনে কর আমি মিথ্যা রটনা করেছি ?' বন্ধু বেশ শান্ত স্বরে উত্তর দিল, 'আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না। তবে কিনা এ বিচিগুলি ভারী অদ্ভুত। এরকম জিনিস যে পৃথিবীতে থাকতে পারে তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আচ্ছা, একটা কথা রইল, এই গাছ যদি আমার চোখের সামনে গজায় তা হলে তুমি আমার বাড়ীর যে জিনিসে প্রথমে হাত দেবে আমি তোমাকে তাই দিতে প্রতিজ্ঞা করছি। কিন্তু যদি তোমার গাছ না দেখাতে পার তা হলে তোমার বাড়ীর যাতে আমি প্রথমে হাত দেব তুমি আমায় তা দিয়ে দেবে।' কম-আক্কেল 'রাজি আছি' বলিয়া ছুটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল, তারপর চীৎকার করিয়া রাঁধুনীকে ডাকিয়া বলিল, 'ওহে বাবুর্চি ভায়া, আমার জঞ্জালনগরীর বিচিগুলি দাও, আমি আমার বন্ধুকে তার গুণ দেখাব।' রাঁধুনী বীজ আনিয়া দিল। বণিক বন্ধুর সম্মুখে তাহা রোপণ করিল। কিন্তু হায়! গাছ কোথায়! বণিক বীজগুলি তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিল, তার পর চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে শয়তান বাবুর্চি, তুই একি

করেছিস ? আমার বিচিগুলি সিদ্ধ করে রেখেছিস ! হুশিয়ার খাঁ সত্যই বলেছিল, রাঁধুনিকে বিশ্বাস করিও না।' তারপর হতভাগ্য বণিক বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, 'এই দেখ ভাই, বিচিগুলি সিদ্ধ করা হয়েছে। আমি হার মানলাম, কিন্তু আমার কোন দোষ নাই। তুমি যদি দয়া করে তোমার দাবিটা ছেড়ে দাও তা হলে খুব ভাল হয়।' বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, 'এমন যে হবে তা আগেই জানতাম। এমন বিচি কি কখনও হতে পারে ? আমি এখন অত সহজে ভুলছি না। এখন হয় তোমার কথা রাখ, নয় আদালতে চল। আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না।' বেচারা কম-আক্কেলের এতক্ষণে চক্ষু ফুটিল; সে এখন বুঝিল যে, তাহার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ও রাঁধুনীই সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল। বেচারা আর কি করে ? পনরো দিন পরে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে স্বীকার করিল। কম-ইখলাক তো প্রথমে পনরো দিন দেরী করিতে কিছুতেই রাজি হয় না, অনেক অনুনয় বিনয়ের পর রাজি হইল।

কম-আক্কেল সেই মুহূর্তে এক মসজিদে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিল, 'হে ভগবান, আমি বাবুর্চিকে বিশ্বাস করেছিলাম, সে বিশ্বাসঘাতকতা করল; বন্ধুকে বিশ্বাস করেছিলাম, সেও আমায় ঠকাল; এখন কেবল তোমারই ভরসা। ভগবান, তুমিই আমায় সাহায্য কর।' বণিক সাত রাত্রি সাত দিন ধরিয়া ক্রমাগত প্রার্থনা করিল, তারপর দৈববাণী হইল, 'জঞ্জালনগরীতে যাও, হুশিয়ার খাঁকে খুঁজিয়া বাহির কর। সে-ই তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে!' বণিক তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে তাহার হীরা-জহরত বোঝাই করিয়া সেই সহরের দিকে যাত্রা করিল; বেলা দ্বিপ্রহরে শহরে পৌঁছিল। সহরের প্রাচীর দেখিতে পাইয়া সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিল, তার পর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রাস্তার ভিড় ঠেলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

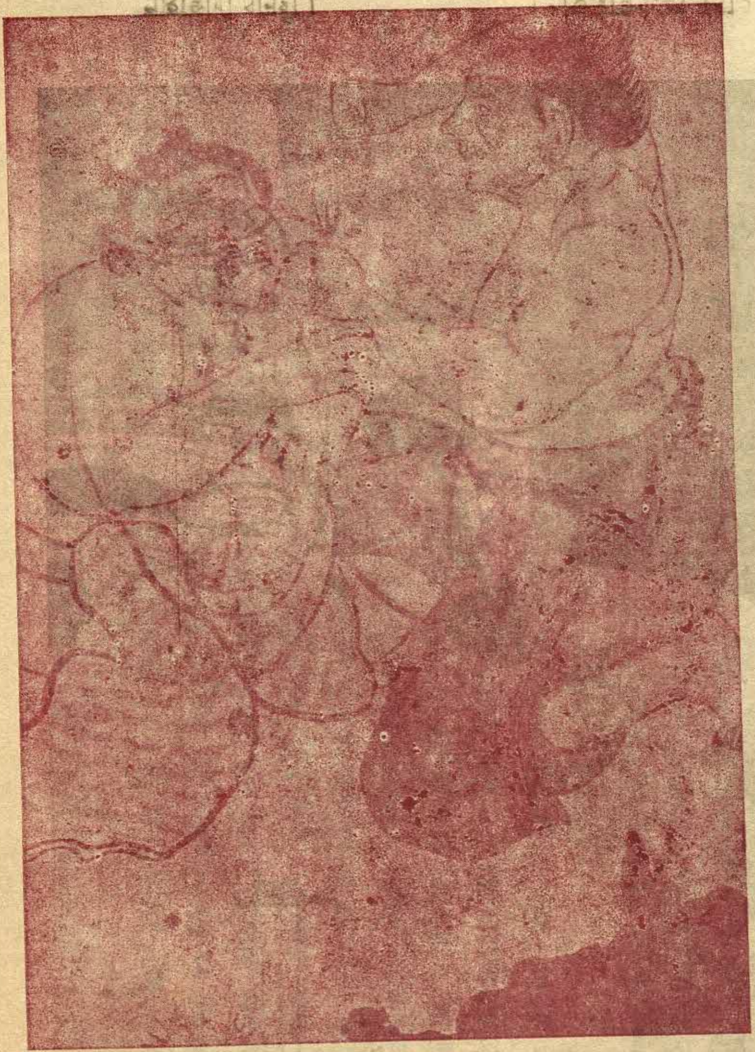
পথে যাইতে যাইতে এক কসাইয়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে ঘোড়ার পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'ওহে পথিক, এর কত দাম নেবে ?' কম-আক্কেল সোজাসুজি বুঝিল যে, সে ঘোড়ার দাম জিজ্ঞাসা করিতেছে, সে বলিল, 'চারশ টাকায় দেব।'

দামটা কিন্তু ঘোড়ার পক্ষে বেশী হইয়াছিল, কারণ ঘোড়াটা বুড়ো আর রোগা ছিল। কিন্তু কসাই যখন টাকা গুনিয়া দিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া বাড়ির দিকে চলিল, তখন বণিক তো অবাক! সে বলিল, 'ওহে থাম থাম, আমার সোনাদানাগুলো নামাতে দাও ওগুলো যে ঘোড়ার পিঠে ঝুলেই রইল!' কসাই বলিল, 'সে কি হে, তুমি না সবসুদ্ধ আমায় চারশ টাকায় বিক্রী করলে ? তখন কি তুমি থলি, জিন, রেকাব, এ-সব বাদ দিয়ে বলেছিলে ? আমার সবসুদ্ধ ঘোড়াটা নেওয়া কিছু অন্যায় হয়েছে ?' এই বলিয়া সে পথিকদিগকে সালিশ মানিল। তাহারা সকলেই একবাক্যে কসাইয়ের পক্ষে রায় দিল। কসাই বিজয়ীর ন্যায় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া মণি মুক্তা ও ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কম-আক্কেল হঠাৎ এরূপ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া এমন অদ্ভুত দেশে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। বেচারা দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সে মনে করিল, কি কুক্ষণে আমি এমন মন্দভাগ্য লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম! তার পর সে হুশিয়ার খাঁর বাড়ীর সন্ধানে চলিল। পথে কয়েকটি বালক খেলা

করিতেছিল। সে তাহাদিগকে হুশিয়ার খাঁর বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। ছেলেরা বলিল, 'বাড়ী দেখাইয়া দিলে কি দিবে?' কম-আক্কেল বলিল, 'আমি তোমাদের সব চেয়ে বড় এক এক গাদা মিঠাই দিব।' তাহারা তৎক্ষণাৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল; একজন দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, একজন একটা মানচিত্র ও আর একজন একটা মাপকাঠি আনিয়া হাজির করিল। তারপর সূর্য্যের স্থান ও বায়ুর গতি এক করিয়া গণনা আরম্ভ করিল। গুনিবার সময় তাহারা অয়নাংশ, দ্রাঘিমা, প্রভৃতি যে সমস্ত কথা ব্যবহার করিতেছিল, কম-আক্কেল জীবনে কখনও সে-সব শুনে নাই। বেচারা ছোট ছেলেদের মুখে এত বড় বড় কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে বালকদের দল 'বের করেছি, বের করেছি' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। সমস্ত পথ মহা উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তাহারা বণিককে হুশিয়ার খাঁর বাড়ী লইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বণিক এই ছোট ছেলেগুলির বিদ্যা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা হুশিয়ার খাঁর বাড়ী জানিত; তাহারা হুশিয়ারেরই পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি, নূতন লোককে অবাক করিবার জন্য বিদ্যার ভান করিয়াছিল। বাড়ী পৌঁছিয়া তাহারা পুরস্কারের দাবি করিল। বণিক এক টাকার মিঠাই কিনিয়া তাহাদিগকে দিল। কিন্তু তাহারা বলিল, 'আপনি সব থেকে বড় একগাদা মিঠাই দেবেন বলেছিলেন; আমরা তাই চাই, আর কিছুই নেব না।' বণিক তখন দ্বিগুণ টাকা দিতে চাহিল, কিন্তু তাহাতেও তাহারা তুষ্ট হইল না। এইরূপে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে বেচারা পঞ্চাশ টাকার মিঠাই কিনিয়া দিল, কিন্তু তখনও তাহারা 'সব চেয়ে বড় মিঠাইয়ের গাদা চাই, আর কিছুই চাই না' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বালকদের জেদ আর অদ্ভুত রকম দাবি শুনিয়া বেচারা হতভম্ব হইয়া গেল; অবশ্য প্রতি কথার মানে ধরিয়া দেখিতে গেলে দাবিটা কিছু অন্যায় হয় নাই। কিন্তু বেচারার আর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার শক্তি ছিল না।

এইরূপ গোলমালের মধ্যে হুশিয়ার খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিককে চিনিতে পারিয়া, সে খুব অভ্যর্থনা আরম্ভ করিল। তারপর কোলাহলের কারণ শুনিয়া বালকদের বলিল, 'ভদ্রোমহোদয়েরা, একটু অপেক্ষা করুন, আমি সব মীমাংসা করে দেব।' এই বলিয়া এক টাকার মিঠাই কিনিয়া, যতগুলি বালক ছিল, ততগুলি অসমান ভাগে সেগুলিকে বিভক্ত করিল। ভাগ হইবার পর বালকদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে, এখানে এগুলো কি রয়েছে?' তাহারা বলিল, 'ওঃ, এ আর কে না জানে? এগুলো তো মিঠাইয়ের ভাগ।' হুশিয়ার খাঁ একজনকে ডাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা বেশ, সব থেকে বড়টা তুলে নাও। এখন তো সব থেকে বেশী পেলে; কি বল?' বালক বলিল, 'হ্যাঁ।' তারপর আর একজনকে ডাকিয়া সব থেকে বড় ভাগটা লইতে বলিল। বালক অবশিষ্ট অংশের মধ্যে সকলের বেশীটা তুলিয়া লইলে হুশিয়ার বলিল, 'কেমন, সব থেকে বেশীটা পেয়েছ তো?' সে বলিল, 'হাঁ মশায়, আমিও পেয়েছি।' এইরূপে সকলে এক একটি ভাগ তুলিয়া লইল এবং সকলেই বড় ভাগ পাইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। সকলের লইবার পর হুশিয়ার খাঁ বলিল, 'কি হে, এখন তো সবাই সকলের বেশী মিঠাই পেয়েছ? এখন খুসী হয়ে পাঠশালায় যাও।' ছেলেরা পাঠশালায় ছুটিল, আর প্রত্যেকেই সকলের



তস্মা শাহ্ ও নগরবাসী দৈত্যের যুদ্ধ
॥ চারি বন্ধুর কথা ॥



ডাইনী রাজকন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।
॥ চারি বন্ধুর কথা ॥



শাহাজাদী বানরী। [সাত রাজপুত্রের কথা]



'পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম।' [সাত রাজপুত্রের কথা]

চেয়ে বেশী মিঠাই পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে লাগিল। পঞ্চাশ টাকার বদলে প্রত্যেকে পাঁচ পয়সার খাবার পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাহারা নিজেদের কোন দিন বোকা মনে করে নাই, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের কাহিনী শুনিয়া বেতের ঘায়ে তাহাদের বোকামি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তারপর হুশিয়ার খাঁ কম-আক্কেলের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; সকল কথা শুনিবার পর সে বলিল, 'বন্ধু তুমি হতাশ হয়ো না, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব; এখন রাত্রিটা বিশ্রাম করে নাও।' ভোরের বেলায় হুশিয়ার খাঁ কসাইয়ের দোকানে গিয়া বলিল, 'ওহে ভায়া, মাথা ক'টার কত দাম নেবে?' কসাইয়ের দোকানে তখন একশটা জানোয়ারের মাথা ছিল, কাজেই সে একশত টাকা চাহিল। হুশিয়ার কিন্তু মানুষের মাথাগুলিসমেত হিসাব করিয়াছিল, সে টাকা ফেলিয়া দিয়া মাথা চাহিল। কসাই দোকানে বিক্রয়ের জন্য যে মাথাগুলি ছিল, তাহা লইয়া আসিল। সে টাকা লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হুশিয়ার চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওহে থাম থাম, আমার সঙ্গে ছলনা করো না! তোমার বাড়ীতে যত মাথা ছিল সব কি দেওয়া হয়েছে? আমি দেখতে পাচ্ছি গোয়াল ঘরে কয়েকটা গরু ভেড়া বাঁধা রয়েছে। তাদের মাথাগুলো এনে দাও।' কসাই কি আর করে, গরু ভেড়াগুলি জবাই করিয়া মাথা আনিয়া দিল। কিন্তু হুশিয়ার তাহাতেও সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল, 'বন্ধু, এইমাত্র দেখিলাম জানালায় কে উঁকি দিচ্ছে, সে বোধ হয় তোমার মেয়ে। আর একটি ছোট ছেলের কান্না শুনলাম, তোমার তা হলে আর একটি সন্তান আছে। আর তোমার যে একজন স্ত্রী আছে তাতে তো কোন সন্দেহই নাই। তা হলে এই তিনজনের মাথাও এনে দাও; ওদের মাথাগুলোও তো আমার কাছে বিক্রী করা হয়েছে।' কসাই মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে তখন তাহার পায়ে পড়িয়া দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। হুশিয়ার খাঁ বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, 'লক্ষ্মীছাড়া, তোর কোন বুদ্ধি নেই। আচ্ছা, আমি এবারকার মত তোকে মাপ করছি। যা, কাল আমার বন্ধুর যে ঘোড়াটা নিয়েছিলি সেটা নিয়ে আয়, টাকার থলিগুলোও আনিস, আর তোর দুর্ব্ব্যবহারের দণ্ডস্বরূপ এক হাজার টাকা জরিমানা নিয়ে আয়।' কসাই কোন আপত্তি না করিয়া সব আনিয়া দিল; মনে মনে ভাবিল বড় বাঁচনটাই বেঁচেছি।

হুশিয়ার খাঁ বাড়ী আসিয়া বণিককে তাহার ধনসম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাই, এখানে আর তিন দিন অপেক্ষা কর, তার পর সহরে গিয়ে কি কাজ করা যায় দেখা যাবে। কিন্তু এখানে সাবধানে চলতে হবে, মনে থাকে যেন। কারণ এদেশের লোকেরা যাদুকর না হলেও ভারি অদ্ভুত জাত, সব কথার চুল-চিরে বিচার করে। এদের হাত এড়িয়ে চলো।' কম-আক্কেল বন্ধুর কথামত চলিতে রাজি হইল।

পরদিন বণিক জুতা কিনিতে বাজারে চলিল। বেচারার পুরানো জুতা জোড়া একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, আর পরা চলে না। সে এক মুচির দোকানে গিয়া বলিল, 'ওহে ভায়া একজোড়া জুতা দাও তো। দামের জন্য কিছু গোলমাল করতে হবে না, আমি তোমাকে খুসী করে দেব।' যথেষ্ট দাম দিবে মনে করিয়াই সে কথাটা বলিয়াছিল। মুচি অনেক রকম জুতা দেখাইল, বণিক তার পায়ের মত একজোড়া লইল। জুতা জোড়ার দাম তাহাদের দেশে চারি টাকা; কাজেই সে চারি টাকা দিতে গেল। কিন্তু

মুচি তাহা লইল না। সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, 'মশাই, আপনি আমাকে খুসী করে দেবেন বলেছিলেন। আমি কেবল খুসী হতে চাই, আমি আর কিছুই চাই না। আপনি লক্ষ টাকা দিলেও আমি নেব না, আমি খুসী হতে চাই।' বণিক দেখিল এ বড় বিপদ। সে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিবে ঠিক করিল। মুচিকে বলিল, 'ভাই, কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ; আমি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে কাল আমার কথামত কাজ করব।' বাড়ী আসিয়া কম-আক্কেল হুশিয়ারকে সব কথা বলিয়া তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। হুশিয়ার বলিল, 'বন্ধু, এই দেখ আমাদের দেশের লোকের জ্ঞানের আর একটা চিহ্ন। তারা আর কিছু জানুক আর না জানুক, কথার মূল্য বোঝে আর কথা রাখতে জানে। তুমি কবে থেকে সোজাসুজি মানুষের মতন কথা বলতে শিখবে বল দেখি ? তোমার রূপক হেঁয়ালি আর বাক্যের অলঙ্কার এর পর ছাড়তে হবে। আমাদের দেশের লোকে ও সমস্ত বোঝে না, তাদের যে কথা সেই কাজ। তারা ওরকম নিরর্থক কথা ব্যবহার করে না। তাদের সঙ্গে কথা বলবার সময় কথার ওজন বুঝে বোলো। এ কাজটা আমি আজ রাত্রেই কেমন সেরে ফেলব দেখো।' দুপুর রাত্রে হুশিয়ার খাঁ আর তার বন্ধু দুই মস্ত মস্ত লাঠি ঘাড়ে করিয়া মুচির বাড়ীতে গিয়া হাজির, সেখানে গিয়া দরজা ভাঙিয়া ফেলে আর কি ! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, 'মুচি ভায়া, বলি, ও মুচি ভায়া, জেগে আছ নাকি ?' মুচি স্বপ্নে মনে করিল, বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। সে তাড়াতাড়ি এক লাফে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, 'কে রে ?' হুশিয়ার খাঁ মোটা গলায় বলিল, 'আমরা রাজবাড়ীর লোক। রাজার এক পুত্রসন্তান হয়েছে, তাই খবর দিতে এসেছি। যদি রাজভক্ত প্রজা হও তো উঠে আমোদ আহ্লাদ কর।' মুচি খবর শুনিয়া রাজকর্ম্ম-চারীদের খুসী করিবার জন্য ছুটিয়া নীচে আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, একটু বসুন, মিষ্টিমুখ করে যাবেন। আমি যে এ কথা শুনে কি রকম খুসী হয়েছি তা বলতে পারি না।' হুশিয়ার বলিল, 'আমরা তোমায় খুসী করেছি ? বেচারা মুচি সরলভাবে উত্তর দিল, 'হাঁ, নিশ্চয়ই।' কম-আক্কেল বলিল, 'আমি তোমায় খুসী করেছি ?' মুচি বলিল, 'হাঁ মহাশয়, নিশ্চয়ই। শপথ করে বলব নাকি ?' তখন দুই বন্ধু হাসিয়া বলিল, 'কি, ভাই, আমাদের চিনতে পারছ না ? আমরা রাজকর্ম্মচারী নয়। আমরা এখন ঋণমুক্ত তো হয়েইছি, অধিকন্তু তোমাকে ঋণী করেছি। তুমি দুবার খুসী হয়েছ স্বীকার করলে। একবার খুসী হওয়া তোমার রইল আর তোমায় যে আর একবার খুসী করলাম তার জন্য দু'শ টাকা দাম দাও। বিনামূল্যে দুবার খুসী হবার তোমার কোন অধিকার নাই।' মুচি বেচারা নিজের ফাঁদে নিজেই পড়িল, তাহাকে দায়ে পড়িয়া দু'শ টাকা দাম দিতে হইল। দুই বন্ধু লাভটা ভাগ করিয়া লইয়া মহা আনন্দে গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

তার পরদিন বণিক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল যে এই দেশের অদ্ভুত লোকদের সঙ্গে আর কিছু কারবারও করিবে না, সম্পর্কও রাখিবে না। কেবলমাত্র সহরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যেই সে বাহির হইয়া পড়িল। ঘুরিতে ঘুরিতে সে প্রকাণ্ড এক চত্বরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল ; দেখিল একটি সুন্দরী মেয়েকে ঘিরিয়া খুব লোকের ভিড় হইয়াছে। সে মধুর উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে,

'দশ হাজার টাকা দিলে এই সব লোকের সামনে চত্বরের মাঝখানে ডিগবাজি খাব।' স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও গর্হিত ব্যাপার। কম-আক্কেলের দেশের আইনে এইরূপ অপরাধী স্ত্রীলোককে পাথর ছুঁড়িয়া মারিয়া ফেলা হয়। জঞ্জালনগরীতেও ইহাকে বড় লজ্জাহীনতার কাজ মনে করা হয়। কাজেই বণিক মনে করিল, মেয়েটি তামাসা করিতেছে; কিন্তু খানিক পরে যখন বুঝিল যে মেয়েটি ঠাট্টা করিতেছে না, তখন তাহার মনে হইল, 'আচ্ছা, দেখা যাক ইহার বেহায়ামি কতদূর গড়ায়! না হয় আমার দশ হাজার টাকাই যাবে।' সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'আমি দশ হাজার টাকা দেব, তোমার তামাসা দেখাও। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ মাটিতে মাথা রাখিয়া সোজা হইয়া উঠিল, এবং এক মস্ত ডিগবাজি খাইল। দর্শকগণ ও বণিক তো দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে তখন আপন পুরস্কার চাহিল। বণিক টাকা দিবার জন্য তাহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিল। সৌভাগ্যক্রমে টাকা দিবার সময় হুশিয়ার খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন অচেনা স্ত্রীলোককে এত টাকা দিতে দেখিয়া, সে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কারণ শুনিয়া বলিল, 'থাম, দেখি আরও সস্তায় সারা যায় কিনা।' সেই রমণী ও বন্ধুর সহিত চত্বরে যাইয়া হুশিয়ার তাহার বেহায়ামির স্থান দেখাইয়া দিতে বলিল। তখনও সেখানে অনেক দর্শক দাঁড়াইয়া ছিল, কাজেই স্থানটি নির্দ্দেশ করা বিশেষ শক্ত হইল না। তাহারা সকলেই বলিল যে, মেয়েটি সত্যসত্যই ডিগবাজি খাইয়াছে; কিন্তু তাহারা ইহাও বলিল, 'হুশিয়ার, এ মেয়েটি অবিশ্যি খুব অন্যায় কাজই করেছে, কিন্তু তোমার বন্ধুর নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া উচিত; তার পক্ষে টাকা নেওয়া ভাল কি মন্দ তোমার বন্ধুর তা বিচার করবার কোনও অধিকার নাই।' হুশিয়ার বলিল, 'মশায়রা, আমার বন্ধু টাকা দিতে খুব রাজি আছেন, কিন্তু আমি সমস্ত কাজটা ঠিক কথামত হয়েছে কিনা দেখে নিতে এসেছি।' এই বলিয়া সে পকেট হইতে দড়ি বাহির করিয়া চত্বরের চারিধার মাপিতে আরম্ভ করিল, তারপর চিহ্নিত স্থানটি পর্য্যন্ত মাপিয়া দেখিল, তাহা ঠিক মাঝখানে নয়। এই দেখিয়া সে সকলের দিকে ফিরিয়া মেয়েটিকে বলিল, 'হ্যাঁরে, তুই না চত্বরের মাঝখানে তোর নির্লজ্জ তামাসা দেখাবি বলেছিলি? এই দেখুন মশায়রা, এটা তো মাঝখান নয়, তার থেকে অনেক দূরে। এখানে তামাসা দেখিয়ে ওর টাকা পাবার কোন অধিকার নাই।' সকলে হুশিয়ারের বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়া গেল। তাহারা সমস্বরে বলিল, 'হাঁ, ওর হার হয়েছে।' তখন হুশিয়ার খাঁ স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'ওরে বেহায়া মেয়ে, একে তো তুই এই রকম নির্লজ্জ ব্যবহারের জন্য ফাঁসি যাবার উপযুক্ত, তার উপর আবার মিথ্যা আচরণ করে পুরস্কার পাবার যোগাড় করছিলি; এর জন্য তোকে ভয়ানক শাস্তি দেওয়া উচিত। এখন হয় আমাদের দশ হাজার টাকা দে, না হলে তোকে রাজার কাছে নিয়ে যাব।' বেচারা মাথাটা বাঁচাইবার জন্য টাকা দিতে বাধ্য হইল; তার পর হইতে আর কোনও দিন তাকে চত্বরের মাঝখানে কিছু করিতে শোনা যায় নাই। দুই বন্ধু টাকা ভাগ করিয়া লইল এবং হুশিয়ার আবার তাহার বন্ধুকে এদেশের লোকদের সঙ্গে মিশিতে বারণ করিয়া দিল।

জঞ্জালনগরী-বাসের তৃতীয় দিনে কম-আক্কেল আর বাহিরে যাইবে না প্রতিজ্ঞা করিল। সে সমস্ত

দিন বাড়ীতে থাকিবে ঠিক করিয়া আর এক পা'ও ঘরের বাহিরে গেল না। কিন্তু দাড়িটা খুব লম্বা হইয়াছে দেখিয়া কামাইবার জন্য এক নাপিতকে ডাকিয়া পাঠাইল। নাপিত আসিলে বলিল, 'নাপিত ভায়া, দাড়িটা ছেঁটে দাও ; আমি তোমায় কিছু দেব।' নাপিত কাজ সারিয়া তাহার প্রাপ্য চাহিল। বণিক তাহাকে দু'টাকা দিতে গেল। কাজের তুলনায় মজুরীটা যথেষ্ট হইলেও নাপিত তাহা লইল না। সে বলিল, 'মহাশয়, "কিছু" দিন, আমি "কিছু" ছাড়া অন্য কোন জিনিস নেব না।' বণিক রাগে ঠোঁট কামড়াইয়া নাপিতের মোটা বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া দ্বিগুণ দাম দিতে রাজি হইল। কিন্তু লোকটা ছুঁইতেই চায় না, সে ক্রমাগতই বলে, 'আমি অন্য জিনিষ চাই না, আপনি "কিছু" দিতে চেয়েছিলেন, আমি সেই "কিছুই" চাই।' বেচারা কম-আক্কেল ক্রমশঃ পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু নাপিতের জেদ ক্রমাগত বাড়িতে লাগিল। সে ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল, 'আমি আপনার টাকায় লাথি মারি! আপনি কি আমার সততা নিয়ে খেলা করতে চান ? আপনি কি পঞ্চাশ টাকা ঘুষ দিতে চান ? পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেও আমি আমার কথা ছাড়ব না। আমি "কিছু" চাই ; অন্য জিনিষ কখনই নেব না।' বণিক কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। সৌভাগ্যক্রমে হুশিয়ার তখনই দেখা দিল। ঝগড়ার কারণ শুনিয়া সে নাপিতকে বলিল, 'ওহে পরামাণিকের পো, কাল সকালে এসে তোমার "কিছু" নিয়ে যেও।' নাপিত চলিয়া গেলে হুশিয়ার একবাটি দুধে একটা মরা আরসোলা ফেলিয়া তাকে তুলিয়া রাখিল। সকালবেলা নাপিত তাহার পাওনা চুকাইতে আসিলে, হুশিয়ার বাটি দেখাইয়া বলিল, 'দুধের বাটিটা নিয়ে এস তো, আমি দুধ খাব।' নাপিত বাটি নামাইয়া দুধে ফোলা আরসোলা ভাসিতে দেখিয়া অনিচ্ছাসত্বেও চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মশায়, এটা খাবেন না। এতে একটা "কিছু" ভাসছে।' হুশিয়ার বলিল, 'ভাই, ও "কিছু"টা তোমার জন্যে, আমায় দুধটা দাও।' সেই লোকটা হৃষ্টচিত্তে আরসোলার ঠ্যাং ধরিয়া লইয়া চলিল এবং চীৎকার করিয়া সকলকে বলিতে আরম্ভ করিল, 'আমি "কিছু" পেয়েছি গো, আমি "কিছু" পেয়েছি। আমি পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে শেষকালে "কিছু" পেয়েছি।' যাহারা তাহার গল্প শুনিল, সকলেই তাহার বুদ্ধি ও সততার প্রশংসা করিতে লাগিল ; বলিল, 'এই তো জঞ্জালনগরীর লোকের মতন কাজ! তুমিই আমাদের মুখ রেখেছো।'

জঞ্জালনগরীতে কম-আক্কেলের তিন দিন বাস হইবার পর হুশিয়ার বলিল, 'বন্ধু, চল এখন তোমার দেশে যাওয়া যাক। এখন তো তুমি আমার তিনটি বচনের মূল্য বুঝেছ ? এখন বল, কিসের জন্য তোমার বন্ধুকে ভয় কর ?' বণিক বলিল, 'আমি বুঝেছি, আমার রাঁধুনি ও বন্ধুতে ষড়যন্ত্র করে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করবার মতলব করেছে। আমার বন্ধু সকলের আগে যে জিনিষে হাত দেবে, আমি তাকে সেইটা দিতে স্বীকার করেছি। সে নিশ্চয় আমার হীরাজহরতের বাক্সে হাত দেবে। সেইজন্য আমি তোমায় আমার এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে বলতে এসেছি।' এই বলিয়া বণিক মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। তখন হুশিয়ার তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'চল, আমরা এখনি রওনা হই। ভয় পেও না ; সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমায় যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলে এই তিন দিনে আমি বোধ হয় তার যথেষ্ট

প্রতিদান দিয়েছি। তবে আমি বচন-পরামর্শাদি বিক্রয় করেই খাই, নিজের মান রাখবার জন্যই আমি তোমার এই বিপদে সাহায্য করব। বলতে গেলে আমিই তো একরকম এর জন্যে দায়ী।' এই বলিয়া দুই জনে যাত্রা করিল; কিছুদিন পরে তাহারা বণিকের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

হুশিয়ার খাঁ কম-আক্কেলের বাড়ী আসিয়া তাহাদের বাড়ীর দালানের মাঝখানে আট হাত উঁচু প্রকাণ্ড এক কাঠের মঞ্চ বাঁধিতে আরম্ভ করিল; বাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র তাহার উপর সাজান হইল। হীরাজহরতের বাক্সগুলি সকলের উপরে স্থানে পাইল। মঞ্চে কিন্তু উঠিবার সিঁড়ি ছিল না। একটা ঠিক আট হাত উঁচু মই খাড়া করিয়া মঞ্চের গায়ে লাগান হইল; আর কোন দিকে কোন উঠিবার পথ রহিল না। এই মইটাই উপরে উঠিবার একমাত্র উপায়, কিন্তু সেটা এমন খাড়া যে তাহার সাহায্যে উঠা প্রায় অসম্ভব। তারপর কম-ইখলাকের ডাক পড়িল। সে আসিলে বণিক বলিল, 'দেখ, মঞ্চের উপর আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি সাজান রয়েছে। ঐ দেখ আমার হীরামাণিকের বাক্স, ঐ আমার গরুবাছুর, দাসদাসী, কাপড়-চোপড়, গহনাপত্র সব তোমার চোখের সামনে রয়েছে। তোমার যা ইচ্ছা তুলে নাও।' কম-ইখলাক একবার মাটির দিকে আর একবার মঞ্চের উপরে চাহিল; 'বাবা, কি উঁচু! মই থেকে একবার পড়লেই হয়, একেবারে মাথার খুলি উড়ে যাবে! তার উপর আবার মইটা কি রকম খাড়া, আর এক দিকে কোথাও কিছুতে আটকানো নেই, মহা সাহসী লোকও এমন মই বেয়ে উঠতে ভয় পায়!' কিন্তু লোকটা লোভে একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তার ভয়ানক জেদ চাপিয়া বসিল। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু এক পা মইয়ে রাখিয়া যেই এক হাতে মই ধরিয়া উঠিতে যাইবে, অমনি হুশিয়ার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল; বলিল, 'আর কেন, বোকারাম! তুমি সকলের আগে মই ছুঁয়েছ, এখন তাই নিয়ে বাড়ী যাও, তোমার প্রাপ্য তো পেলে। শেষকালে একটা মই জিতলে! যেমন বিশ্বাসঘাতক, তেমনি হয়েছে।' দুরাচার বন্ধু তখন অত্যন্ত নিরাশ মনে মই পিঠে করিয়া সহরের ভিড়ের ভিতর দিয়া চলিল। চারদিকে সকল লোক খুব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

চারি বন্ধুর কথা

কোন নগরে চারিজন বন্ধু বাস করিত। তাহাদের মধ্যে এক জন রাজার ছেলে, এক জন সেকরার ছেলে, এক জন পণ্ডিতের ছেলে, আর এক জন ছুতারের ছেলে। তাহারা চারি জন প্রায় এক সঙ্গে কুস্তি লড়িত ও সকলেই খুব সাহসী ও বলবান ছিল। একদিন তাহাদের কুস্তি লড়িবার সময় এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল; সে আসিয়াই তাহাদের চারিদিকে চারটি দেওয়াল গাঁথিয়া ফেলিল, তারপর চারি বন্ধুকে বলিল, 'তোমাদের মধ্যে যার ক্ষমতা আছে সে এই দেয়ালগুলো ভাঙ।' সকলেই চেষ্টা করিল, কিন্তু রাজপুত্র ছাড়া আর কেহই পারিল না। তখন দৈত্য রাজপুত্রকে বলিল, 'তুমিই দেখছি সব থেকে

জোরালো, তবে তুমিই লোহাগড়ে যাও। সেখানে একজন দৈত্য আর একটি পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বাস করে। সে কন্যা তোমারই উপযুক্ত। তুমি সেখানে গিয়ে দৈত্যটাকে মেরে ফেলো। তাহলে তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে জোয়ান বলে পরিচিত হবে, আর রাজকন্যাকেও বিয়ে করতে পারবে।' রাজপুত্র দৈত্যের কথা শুনিয়া, রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে যাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পিতার মত লইয়া, শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি আপনার তিন বন্ধুকে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও তাঁহার সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে তাহারা লতায় পাতায় ঢাকা একটি নির্জ্জন সুন্দর জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে একটি কূয়াও ছিল। স্থানটি দেখিয়া চারি বন্ধুর সেইখানেই বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইল। তিনজন শিকার করিতে বাহির হইল, সেকরার ছেলে রান্না করিবার জন্য রহিয়া গেল। সে রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিয়া কাছাকাছিই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে ভীষণ-মূর্ত্তি এক দৈত্য কূয়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। বেচারা তো ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দৈত্য বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, 'আমাকে কিছু খাবার দাও।' সেকরার ছেলে সাহসে ভর দিয়া উত্তর করিল, 'আমি এখনও কোন সাধু ফকিরকে কিছু খাবার দিইনি, তোমাকে কি করে দেব ? তুমি এখন বসে থাক, আমার বন্ধুরা যখন ফিরে এসে খেতে বসবে, তখন তোমাকেও কিছু দেব।' এই কথা শুনিয়া দৈত্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হাত ধরিয়া দূরে ছুঁড়িয়া দিল ও সমস্ত খাবার লইয়া কূয়ার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। তিন বন্ধু শিকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুই খাইতে পাইল না। তাহারা তখন ছুতারের ছেলেকে রন্ধন করিবার জন্য এবং দৈত্যকে শাস্তি দিবার জন্য রাখিয়া আবার শিকারে বাহির হইল। দৈত্য আসিয়া তাহাকেও হারাইয়া দিল। তৃতীয়বার পণ্ডিতপুত্র রহিল ; তাহারও ঐ দশা হইল। অবশেষে রাজপুত্র স্থির করিলেন যে এবার তিনিই থাকিবেন ; তিন বন্ধু তাঁহাকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। যথাসময়ে দৈত্য কূপ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া খাবার চাহিল। রাজপুত্র বলিলেন, 'তোমার তো আস্পর্দ্ধা কম নয় ! আমি এখনও কোন পীরকে কি ফকিরকেও খাবার দিইনি, আর তোমাকে দেব ? এখন বসে থাক, পরে পাবে।' এই কথা শুনিয়া দৈত্য গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, রাজপুত্রও তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে দৈত্য কূপে লাফ দিয়া পড়িল। কিন্তু রাজপুত্র ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিও কূপে লাফ দিয়া পড়িয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে দৈত্য একেবারেই হারিয়া গেল। দৈত্যের নাম ছিল তসমা শাহ্। হারিয়া গিয়া সে রাজপুত্রের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল এবং আপনার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতেও চাহিল। রাজপুত্র কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। তিনি লোহাগড়ের বন্দিনী রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দৈত্যকে অসন্তুষ্ট করা উচিত হইবে না মনে করিয়া তিনি সেকরার ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহের ঠিক করিয়া দিলেন। তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইবার পরই, তাঁহারা বরকন্যাকে সেইখানেই রাখিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন ; তাঁহাদের এক জন পিছনে পড়িয়া রহিলেন বটে, কিন্তু

তাঁহাদের সংখ্যা কমিল না; দৈত্য তসমা শাহ্ তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। সে সঙ্গে থাকাতে তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার হইল, কারণ তাহার বাধ্যতা, সাহস ও বলবীর্য্য তাঁহাদের যথেষ্ট কাজে লাগিয়াছিল। কিছুদিন চলার পর তাঁহারা এক জনমানবহীন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ঐ নগরের সমস্ত গৃহেরই দরজা বন্ধ। সমস্ত নগর ভ্রমণ করিয়া, এক প্রকাণ্ড ময়দানের মধ্যে এক জন মাত্র জীবিত প্রাণী দেখিতে পাইলেন। সে একটি পরমা সুন্দরী বালিকা, হাতে এক ফুলের সাজি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের দেখিয়াই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তোমরা এখান থেকে শীঘ্র পালাও। এক জন ভয়ানক দৈত্য এই নগরে বাস করে, সে এখুনি আসবে, আর তোমাদের দেখতে পেলেই খেয়ে ফেলবে।' দৈত্যগণ ইচ্ছামত আপনাদের রূপ পরিবর্তন করিতে পারে; তাই দৈত্য তসমা শাহ্ মানুষের রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, 'তা হোক, আমরা এইখানেই থাকব।' তাঁহারা সেই ময়দানেই রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিলেন। তিন বন্ধু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন, তসমা শাহ্ পাহারা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, এক জন ভীষণাকৃতি দৈত্য তাহাদের দিকে আসিতেছে। দৈত্যটা এত লম্বা যে, তাহার মাথা আকাশে ঠেকিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই তসমা শাহ্ মাটিতে পড়িয়া একবার গড়াগড়ি দিল, অমনই তাহার দৈত্যের রূপ ফিরিয়া আসিল। সে আপনার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাসম্ভব বাড়াইল, কিন্তু কিছুতেই নগরবাসী দৈত্যের কাঁধের চেয়ে উঁচু হইতে পারিল না। দুই জনে তখন যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তাহাদের যুদ্ধের চোটে নগরের ঘরবাড়ী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তসমা শাহ্ অন্য দৈত্যকে মারিয়া ফেলিল। তখন ভোর হইয়া আসিয়াছে। মৃত দৈত্যের প্রকাণ্ড শরীরটা অনেক ক্রোশ জুড়িয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পড়ার শব্দে দেশে যে অল্প ক'জন অধিবাসী বাকি ছিল, তাহারা সকলেই বাহির হইয়া আসিল। দৈত্যটা রোজ দশ জন করিয়া মানুষ খাইয়া নগর প্রায় খালি করিয়া ফেলিয়াছিল। ঐ দুরাচার দৈত্য হত হইয়াছে শুনিয়া দেশের রাজা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; সেই সঙ্গে আনন্দটাও খুব হইল। তিনি ঐ চারি ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের খুব প্রশংসা করিলেন, রাজপুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলেন। কিন্তু রাজপুত্র তাহাতে রাজি না হইয়া, পণ্ডিতের পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা রাজা তাহাই করিলেন।

দ্বিতীয় বন্ধুর বিবাহ হইয়া গেল। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী ঐ নগরেই থাকিয়া গেলেন এবং বাকি দুই বন্ধু ও তসমা শাহ্ আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পর তাঁহারা আরও একটি নিঝুম নিস্তব্ধ জনহীন নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, এক জায়গায় অনেকগুলি বড় বড় দুধের ভাঁড় সাজান রহিয়াছে এবং সেইখানে একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তিন বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কেন একলা দাঁড়াইয়া আছে এবং কেনই বা নগরের সকল গৃহের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। সে বলিল, 'প্রত্যেক দিন এক সিংহ এসে দশ ভাঁড় দুধ আর একটি মানুষ খায়। এই দুধের ভাঁড় তার জন্যে; আজ আমার পালা, আমাকে সে এসে খাবে। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, শীঘ্র চলে যাও।' কিন্তু তাঁহারা সে স্থান হইতে না গিয়া ছেলেটিকে

অনেক আশ্বাস দিলেন ও তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধু শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন, আর তসমা শাহ্ আগের মতন পাহারা দিতে লাগিল। মাঝরাত্রে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনের মতন শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল যে, এক বিকটাকৃতি সিংহ আসিতেছে। সে আসিবামাত্র তসমা শাহ্ তাহাকে আপনার গদার ঘায়ে বধ করিল। ভোরবেলা নগরের উজির যখন নগর পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের পরম শত্রু সিংহের মৃতদেহ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। বালকটি ও তিন বন্ধু নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। উজির তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে সিংহ মারিয়াছে ?' তাঁহারা সকল কথা বলিলে পর তিনি তাঁহাদিগকে পরম সমাদর করিয়া রাজার নিকটে লইয়া গেলেন। রাজা তাঁহাদের কাজে খুব খুসী হইয়া পুরস্কার স্বরূপ আপনার কন্যার সহিত ছুতারের পুত্রের বিবাহ দিলেন। এইরূপে একে একে তাঁহার সকল বন্ধুকেই পথের মাঝখানে ত্যাগ করিয়া রাজপুত্র শুধু তসমা শাহ্‌কে লইয়া লোহাগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। অনেক দিন চলার পর একদিন তাঁহারা আপনাদের গম্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, গড়ের এক উচ্চ বুরুজে একটি পরমাসুন্দরী রমণী বসিয়া রহিয়াছেন। তসমা শাহ্ রাজকুমারকে পিঠে লইয়া এক লাফে দুর্গের বুরুজে উঠিয়া পড়িয়া তাঁহাকে সেই রমণীর সম্মুখে লইয়া গেল। তারপর সে গড়বাসী দৈত্যের সন্ধানে চলিল ও যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিল। এদিকে রাজকন্যা তাঁহার কারাগৃহে এক অজানা অতিথির আবির্ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি দৈত্যের ভয় দেখাইয়া রাজপুত্রকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে বলিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'আপনার কোন ভয় নাই, সে দৈত্যকে আমরা মেরে ফেলেছি।'

তাহার পর তাঁহারা বিবাহ করিয়া পরম সুখে সেই দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুর্গের উপরে বুরুজে থাকিতেন আর তসমা শাহ্ নীচে থাকিত। সে রাজকন্যার বাসস্থানকে খুব পবিত্র মনে করিত। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, কখনও উপরে উঠিবে না। রাজপুত্র প্রতিদিন নীচে আসিয়া তাহাকে খাবার দিয়া যাইতেন, তাহা খাইয়াই সে প্রাণধারণ করিত।

রাজকন্যা একদিন দুর্গের কাছেই কোন এক নদীতে স্নান করিতে গেলেন। স্নান করিতে করিতে তাঁহার একপাটি জুতা জলে ভাসিয়া গেল। জুতাটি নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এক নগরের রাজবাড়ীর স্নানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। সেইখানে সেখানকার রাজপুত্র স্নান করিতেছিলেন। রাজপুত্র জুতাটি তুলিয়া লইয়া দেখিলেন যে, তাহা রমণীর জুতা ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জুতাটি যাহার তাহাকে বিবাহ করিবেন ; এই স্থির করিয়া তিনি জুতাটি উঠাইয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া তিনি আপনার কাজকর্ম্ম সমস্ত ফেলিয়া এক কোণে বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজবাড়ীর সকলে তো মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিল ! রাজপুত্রের কি হইল কেহই ভাবিয়া পায় না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কিছু উত্তর দেন না। অবশেষে রাজা আসিয়া অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলিলেন, 'এই জুতোটি যে মেয়ের তাঁর সঙ্গে যদি আমার বিবাহ হয়, তা হলেই আমি প্রাণধারণ করব, না হলে আমি নিশ্চয়ই



'খুব মন দিয়া সে সেতার বাজাইতেছিল।'
॥ সাত রাজপুত্রের কথা ॥



ক্ষীণদৃষ্টি হাজার মাইল উপর হইতে তীর পড়িতে দেখিতেছে।
॥ রাজকুমার শামসের জঙ্গের কথা ॥



শামসের জঙ্গ রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ॥ শামসের জঙ্গের কথা ॥



আত্মহত্যা করব।' রাজা কুমারের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, আর কোনমতেই তাঁহার মত বদলান যাইবে না। অগত্যা তিনি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজপুত্র তখন উঠিয়া আহারাদি করিলেন, রাজপুরীর সকলেও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এদিকে রাজা মন্ত্রণা-গৃহে গিয়া, রাজ্যের যত ডাইনীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে, ঐ জুতার অধিকারিণী সুন্দরীকে আনিয়া দিতে হুকুম করিলেন। অনেকেই আপনাদের অক্ষমতা জানাইয়া বিদায় লইল। বাকি দলের মধ্যে একজন ছিল, সে নদী সরোবর প্রভৃতিকেও জাদু করিতে পারিত। সে এই কাজের ভার লইল। ডাইনী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে নদীতে এক ডুব দিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোহাগড়ের ঘাটে আসিয়া মাথা তুলিল ও সেইখানে বসিয়া চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। রাজকন্যা তাহার কান্নার শব্দ শুনিয়া তাহাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার সযত্নে-রচিত দুঃখকাহিনী শুনিয়া দয়া করিয়া তাহাকে আপনার দাসী করিয়া লইলেন। ডাইনী কিছুকাল সেখানে বাস করার পর একদিন রাজকন্যাকে বলিল, 'আচ্ছা রাজকন্যা, তুমি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা কোরো তো যে তাঁর প্রাণ কিসের মধ্যে আছে।' রাজকন্যা তাহার কুঅভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবেই আপনার স্বামীকে ঐ প্রশ্ন করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, 'এই যে তলোয়ারখানি দেখছ এতেই আমার প্রাণ আছে। যতদিন এখানা চকচকে থাকবে, ততদিন আমিও সুস্থদেহে বেঁচে থাকব; কিন্তু এতে মরচে পড়ে গেলেই আমি মারা যাব।' সরলা রাজকন্যা তখনই আপনার দাসীকে ঐ কথা বলিয়া ফেলিলেন। দুষ্টা ডাইনী উহা শুনিয়া মহা খুসী! সে সমস্তক্ষণই আপনার অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। একদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইবার পর, সে গোপনে রাজপুত্রের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে তলোয়ারখানি লইয়া তাহা জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলিয়া দিল। চকচকে তলোয়ারখানি আর চকচকে রহিল না; সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রও প্রাণত্যাগ করিলেন। ডাইনী তখন রাজকন্যাকে পিঠে করিয়া নদীতে ডুব দিয়া তাঁহাকে রাজবাটীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা আর তাঁহার পুত্র রাজকন্যাকে পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা জাগিয়া উঠিয়া আপনার বিপদ দেখিলেন, কিন্তু অস্থির হইয়া না পড়িয়া, সাহসে ভর করিয়া শীঘ্রই মুক্তিলাভের একটি উপায় স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি এক বৎসর পরে রাজপুত্রকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রাজা আর কি করেন? ইহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু রাজকন্যাকে তিনি বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। এদিকে লোহাগড়ে তসমা শাহ্ খাবারের অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিল, রাজপুত্র প্রাণত্যাগ করাতে এখন আর তাহাকে কেহই খাইতে দিত না। এক সপ্তাহ অনাহারে থাকিয়া বেচারাকে অবশেষে বাধ্য হইয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে হইল। উপরে উঠিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়াই সে অবস্থাটা বুঝিতে পারিল। তাড়াতাড়ি অগ্নিকুণ্ডের কাছে ছুটিয়া গিয়া সে তলোয়ারখানি টানিয়া বাহির করিল ও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাহার কোনও অংশ উজ্জ্বল আছে কি না দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর সে দেখিল তলোয়ারের আগাটা এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। তসমা শাহ্ তখন একখানা

পাথরের উপর তলোয়ারখানি ঘষিতে আরম্ভ করিল এবং বহু পরিশ্রমের পর সেখানিকে আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। রাজপুত্রও প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তসমা শাহের কাছে সকল সংবাদ শুনিয়া তিনি ভয়ানক রাগিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুইজনে রাজকন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা পণ্ডিতপুত্র প্রভৃতি অন্য তিন বন্ধুকেও সঙ্গী করিয়া লইলেন। অনেক দিন ভ্রমণের পর, রাজকন্যা যে নগরে বন্দী ছিলেন, তাঁহারা সেই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা যে এক বৎসর সময় চাহিয়াছিলেন, সেই সময় পূর্ণ হইবার কয়েকদিন আগে তাঁহারা আসিয়াছিলেন। রাজপুত্রের বিবাহের সময় নিকটবর্ত্তী হওয়াতে রাজ্যে খুব সমারোহ লাগিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা চার বন্ধুতে মিলিয়া, রাজকন্যার সহিত কিরূপে দেখা করা যায় তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে পণ্ডিতপুত্র গণৎকারের বেশে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া আপনার ভাগ্যগণনা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি তখন রাজকন্যাকে আপনাদের আগমনের সংবাদ দিলেন এবং তাঁহার উদ্ধারের জন্য কি উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। বিবাহের আগের দিন রাজকন্যা রাজাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের দেশের একটি প্রথা আছে যে, বিবাহের আগের দিন কন্যাকে বর ও ঘটকের সহিত একটি সোনার পুষ্পক রথে চড়িয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে হয়। রাজা ইহাতে আপত্তি করিবার কোনও কারণ দেখিলেন না। তিনি এরূপ একটি রথের খোঁজে নগরের চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে তসমা শাহ্, ছুতারের পুত্র ও স্বর্ণকারের পুত্রের সাহায্যে ঐরূপ একখানি পুষ্পক রথ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য রাজবাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা কিনিয়া ফেলিয়া রাজকন্যা, ডাইনী ও আপনার পুত্রকে লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। নগরের চারিদিকে কয়েকবার ঘুরিয়া, রাজকন্যা একস্থানে তাঁহাদিগকে রথ থামাইতে বলিলেন। রথ থামিবামাত্র রাজপুত্র আপনার চারি বন্ধু লইয়া তাহাতে লাফ দিয়া চড়িয়া বসিলেন এবং সজোরে উহা চালাইয়া দিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই লোহাগড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়া ডাইনী, রাজা আর তাঁহার পুত্রকে তাঁহারা নদীর জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিলেন। তার পর সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

সাত রাজপুত্রের কথা

সেকালে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সাতটি পুত্র ছিল। সব কয়টিই সুশ্রী, সুশিক্ষিত এবং সাহসী। তাঁহাদের পিতা তাঁহাদিগকে খুব ভালবাসিতেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সাতজনে সর্ব্বদাই এক রকম পোষাক পরিয়া থাকিতেন ও একই রকম উপহারাদি পাইতেন। তাঁহারা যখন বড় হইলেন, তখন রাজা প্রত্যেককে বাস করিবার জন্য এক-একটি সুন্দর সাজান অট্টালিকা দিলেন।

সেগুলিও দেখিতে ঠিক একই রকমের ছিল বলিয়া একটি দেখিলেই সাতটি দেখার কাজ হইয়া যাইত। তাঁহাদের পিতার এইরূপ ব্যবহারে তাঁহারা অতিশয় সুখে বাস করিতেন ও পরস্পরকে খুব ভালবাসিতেন।

রাজপুত্রদের যখন বিবাহের বয়স হইল, তখন রাজা সাতটি সমান সুন্দরী ও শিক্ষিতা রাজকুমারীর সন্ধানে পৃথিবীর চারিদিকে দূত পাঠাইলেন। রাজার দূতগুলি পৃথিবীর সকল দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু সেরূপ সাতটি পাত্রী কোথায়ও পাইল না। অবশেষে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমরা সপ্তদ্বীপ ঘুরে এলাম, অনেক সাগর আর পর্ব্বত পার হলাম, দরিদ্রের কুটীর আর রাজপ্রাসাদ—সব জায়গাতেই গেলাম, কিন্তু কোনখানেও এক রকম রূপসী, শিক্ষিতা আর সুশীলা সাতটি পাত্রী পেলাম না। রাজকুমারদের উপযুক্ত কন্যা পাওয়া অসম্ভব।' রাজা তাহাদিগের কথা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেন। সেই দেশের রাজমন্ত্রী খুব বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি রাজাকে চিন্তিত ও গম্ভীর দেখিয়া, তাঁহার দুঃখ দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষকালে তিনি একটি উপায় স্থির করিলেন। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জোড়হাত করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি এই বিষয়ের জন্য এত চিন্তিত হবেন না। আপনি রাজকুমারদের জন্য যেমন পাত্রী চান, তেমন পাত্রী পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু 'তদ্‌বীর' অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা যখন বিফল হয়, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 'তক্‌দীর' অর্থাৎ নিয়তির উপর নির্ভর করেন। আপনি রাজকুমারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তাঁরা দৈব ঘটনার দ্বারা যাঁর ভাগ্যে যেরূপ পাত্রী জুটে, তাতেই সন্তুষ্ট হতে রাজী আছেন কি না। যদি তাঁরা রাজী হন, তা হলে এ ব্যাপারটা খুব সহজেই মিটিয়ে ফেলা যাবে।' রাজা তৎক্ষণাৎ আপনার পুত্রদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকল কথা শুনিয়া মন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজী হইলেন। তখন সকলে কেল্লার সর্ব্বাপেক্ষা উঁচু বুরুজের নীচে গিয়া দাঁড়াইলেন; সেই জায়গা হইতে চারিদিকে অনেক ক্রোশ অবধি দেখা যাইত। সাত রাজকুমারের সামনে সাতটি ধনুক ও তীর রাখা হইল এবং তাঁহাদিগকে যেদিকে ইচ্ছা তীর ছুঁড়িতে বলা হইল। যাঁহার তীর যে বাড়ীতে পড়িবে, তাঁহাকে সেই বাড়ীর কন্যা বিবাহ করিতে হইবে, তা সে রাজার মেয়েই হোক আর চাষার মেয়েই হোক। তখন সাত রাজকুমার ধনুক লইয়া সাতদিকে তীর ছুঁড়িলেন। ছোট রাজকুমার ছাড়া সকলের তীরই ধনবান লোকদের বাড়ীতে পড়িল। কিন্তু ছোট রাজকুমার যে তীর ছুঁড়িলেন, তাহা নগর ছাড়াইয়া চলিয়া গেল, কেহই আর উহা দেখিতে পাইল না। তীরের সন্ধানে চারিদিকে লোক দৌড়িল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাহারা সেটি পাইল। তীরটি এক গাছের ডালে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং সেই ডালে একটি বানরী বসিয়াছিল।

ছোট ছেলের এইরূপ দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া রাজা দুঃখিত হইলেন। তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই ছোট রাজপুত্রকে আর একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিতে বলিলেন; বানরীর সঙ্গে তো আর মানুষের বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু রাজকুমার বলিলেন, 'বাবা, ভাগ্যে ছিল বলে আমার আর সকল ভাই সুন্দরী ও সুশীলা স্ত্রী পেয়েছেন। আমিও আমার ভাগ্যে যা ছিল তাই পেয়েছি। আমি এর জন্য খেদ

বা হিংসা করছি না, আমি হিংসুটে নই। তীর ছোঁড়বার আগে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তা আমাকে ভাঙতে বলবেন না। আমাকে আবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে বলবেন না; আমাদের জীবন ঘাসের উপর শিশিরবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী; আমরা ছায়ার মত আসি যাই, কিন্তু আমাদের কথা চিরস্থায়ী, উহার নড়চড় হয় না। আমি আমার কথা রাখব। বানরীকে যে বিয়ে করা যায় না তা আমি জানি, কিন্তু আপনারা সবাই জেনে রাখুন যে আমি কখনো বিয়ে করব না। আমি ঐ বানরীটিকেই বাড়ী নিয়ে গিয়ে চিরকাল তাকে যত্ন করে পালন করব।' এই বলিয়া তিনি নগরের বাহির হইয়া বানরীকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

অন্য ছয় রাজকুমারের খুব ধুমধামে বিবাহ হইল। সমস্ত নগর আলোর মালা দিয়া সাজান হইল, এবং প্রত্যেক রাস্তাতেই বাজী পোড়ান আর গানবাজনার ঘটা পড়িয়া গেল। নগরের লোকেরা আপন আপন বাড়ী আমের পল্লব আর কলাগাছ দিয়া সাজাইল, বণিকরা নিজের নিজের দোকানে নূতন করিয়া রঙ দিল ও নিজেদের বহুমূল্য জিনিসগুলি বাহির করিয়া সাজাইয়া পথের লোকের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। সমস্ত নগর জুড়িয়া আমোদ-আহ্লাদ লাগিয়া গেল, সকলেই খুব স্ফূর্তি করিতে লাগিল। কেবল ছোট রাজকুমার দুঃখিত মনে একলাটি নিজের বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। তিনি আপনার বানরীটির গলায় একটি হীরার হার পরাইয়া তাহাকে একটি মখমলের চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, 'বেচারী বানরী, আজকের আনন্দের দিনে আর কেউ তোমার কিংবা আমার খোঁজ নিচ্ছে না। কিন্তু আমি তোমাকে সুখী করব, তোমার বন্দীদশাটাও সুখের করব। সোনার শেকলটা ধরে অত জোরে টেন না, কেবলমাত্র এই জায়গাটাই তোমার পক্ষে নিরাপদ। তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?' এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটি সোনার থালায় করিয়া অনেক সুন্দর ফল খাইতে দিলেন। এইরূপে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াই তিনি দিন কাটাইতেন। তাঁহার অদ্ভুত পছন্দের জন্য অন্য কেউ তো আর তাঁহার কাছে আসিত না! কেউ ইহাকে তাঁহার বোকামি, কেউ পাগলামি, আবার কেউ বা তাঁহার জিদ বলিত।

ছোট রাজকুমারের অদ্ভুত খেয়াল দূর করাইয়া কিরূপে তাঁহাকে কোন যোগ্য বংশে বিবাহ করান যাইতে পারে এই বিষয়ে রাজা রোজ তাঁহার মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। কিন্তু পিতা, ভ্রাতা, মন্ত্রী, বন্ধু সকলের কথারই রাজকুমার এক উত্তর দিতেন, 'আমি কথা দিয়েছি; মানুষের কথা পাহাড়ের চেয়েও অটল, তার মূল্য স্ত্রী কিম্বা পৃথিবীর চেয়েও ঢের বেশী।' এইরূপে মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মত বদলানর কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। বরং তিনি যেন ক্রমেই বানরীকে বেশী করিয়া ভালবাসিতে লাগিলেন। বানরীটিও যেন তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, সেও ভাবভঙ্গীর দ্বারা যথাসাধ্য নিজের ভালবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানাইত।

রাজা একদিন নিজের সাত ছেলেকে একত্র ডাকিয়া বলিলেন, 'বাছা তোমরা সকলেই সুখে ঘর করছ, তা আমি দেখছি। ছোট রাজকুমার, তুমিও তোমার অদ্ভুত সঙ্গিনীর সঙ্গে সুখেই আছ বলে বোধ হয়। তোমরা জান যে, ছেলেমেয়ের সুখেই বাবার সুখ। আমি আমার বউদের দেখতে, আর তাদের

কিছু উপহার দিতে চাই।' তখন বড় রাজকুমার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি যদি অনুগ্রহ করে কাল আমাদের বাড়ী যান, তা হলে আমরা খুব সুখী হব।' রাজা আহ্লাদের সহিত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। বড় রাজকুমার রাজার অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন করিলেন। রাজবধূও বহুমূল্য বেশভূষা করিলেন। তাঁহাকে যথাসম্ভব সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য তাঁর দাসীরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিল। রাজা ঠিক সময়ে রাজকুমারের বাড়ী আসিলেন এবং তাঁহার জন্য তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ কত আয়োজন করিয়াছে দেখিয়া খুব খুসী হইলেন। তারপর তাঁহাদের দুজনের হাত ধরিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বহুমূল্য রত্ন আর পোষাক উপহার দিলেন, কিরূপে অনেকদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করা যায়, সে সম্বন্ধেও অনেক উপদেশ দিলেন। অনেকক্ষণ সেখানে থাকিয়া, তারপর তিনি আপনার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

তার পরদিন তাঁর মেজ ছেলে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। সেখানেও তিনি যথেষ্ট আদর যত্ন লাভ করিয়া খুব খুসী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে নিজের ছয় ছেলের সঙ্গে দেখা করিলেন; প্রত্যেক বাড়ীতেই তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ যথেষ্ট সম্মান এবং জাঁকজমকের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এইবার বানরীর স্বামী ছোট রাজকুমারের নিমন্ত্রণ করিবার পালা আসিল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বানরীটি অনেক বড়ঘরের মেয়ে অপেক্ষাও শান্তশিষ্ট এবং ভদ্র হইলেও, যে বাড়ীর গৃহিণী বানরী, সে বাড়ীতে তিনি কিরূপে নিজের পিতাকে নিমন্ত্রণ করেন? তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বানরীকে বলিলেন, 'হায় ভাষাহীন জীব, তুমিই আমার সুখদুঃখের একমাত্র সাথী; আমি এখন কি করব বলে দাও। তোমার যদি কথা বলবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে তুমি এখন আমাকে সান্ত্বনা দিতে। আমার সব ভাইয়েরাই বাবাকে নিজের নিজের বাড়ী আর স্ত্রী দেখিয়েছেন। তিনি যখন এখানে আসবেন, তখন আমি তাঁকে কি দেখাব? আমার তাঁকে নিমন্ত্রণ করতেই ভয় করছে। এখনই সবাই আমাকে ঠাট্টা করে, কিন্তু আমি যখন বাবাকে নিমন্ত্রণ করে তোমাকে আমার স্ত্রী বলে তাঁকে দেখাব, তখন না জানি আমাকে আরও কত ঠাট্টা সহ্য করতে হবে।' এইরূপে বানরীর সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ কথা বলিলেন; তাঁর সঙ্গে মানুষের মত কথা বলা তাঁর অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। তার থেকে ধীর আর মনোযোগী শ্রোতাও তাঁর পাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি যতক্ষণ তার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিতেন ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেন, ততক্ষণই সে অত্যন্ত গম্ভীর ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টাতেও কখনও তাঁর ত্রুটি দেখা যাইত না। রাজকুমার মাঝে মাঝে তার অসাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। কিন্তু বানরী যখন মানুষের ভাষায় বলিল, 'দুঃখ কোরো না, নিরাশ হোয়ো না, তোমার ভাইরা যেমন করেছেন তেমনি তুমিও গিয়ে তোমার বাবাকে নিমন্ত্রণ কর, বরং উপরি তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব, সৈন্যসামন্ত আর চাকরদেরও নিমন্ত্রণ কোরো। আমি যা বলেছি, তুমি তাই কর,' তখন তিনি খুব বেশী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! রাজকুমার ভাবিলেন, 'হা ভগবান, একি আশ্চর্য্য কাণ্ড!' তারপর তিনি বাহির হইয়া রাজাকে দলবলসহ নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। রাজার পারিষদবর্গ

ও সৈন্যগণ নিমন্ত্রণ পাইয়া রাজকুমারের মতলব ঠিক করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অনেকে অনেক রকম কারণ স্থির করিল, কিন্তু এটা যে তাঁহার বোকামির আর একটা নিদর্শন, সে বিষয়ে সকলেই একমত হইল। তাঁহাকে ঠাট্টা করিবারও সকলের আর একটা সুবিধা মিলিল।

একলা গম্ভীর হইয়া বসিয়া রাজকুমার ভাবিতেছিলেন, এখন তাঁহার কি করা উচিত; হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বানরী তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছে। তিনি বলিলেন, 'কি শাহ্‌জাদী (তিনি পরিহাস করিয়া উহাকে ঐ নামে ডাকিতেন), তুমি আমাকে বেশ বিপদেই ফেলেছ। তোমার কথায় তো আমি রাজাকে আর সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি; এখন তাঁদের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করবার মত টাকা আর লোক কোথায় পাই? বল দেখি আমি কি করি? কথা বলছ না কেন, তোমার কথা বলবার ক্ষমতা চলে গিয়েছে নাকি?' কিন্তু বানরী আগেকার মত চুপ করিয়া রহিল। শেষে রাজপুত্রের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, তার কথা বলার ব্যাপারটা সম্বন্ধে বোধ হয় তিনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। রাজকুমার আবার তাকে কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবারেও কোন ফল হইল না। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, সে একটুকরা হাঁড়ি-ভাঙা লইয়া রহিয়াছে ও সেইটি লইবার জন্য তাঁহাকে ইঙ্গিত করিতেছে। তিনি তাহার নিকটে আসিয়া সেইটি লইলেন ও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে তাহাতে অতি সুন্দর অক্ষরে এই কথাগুলি লেখা রহিয়াছে, "আমি কথা বলিতেছি না বলিয়া বিরক্ত হইও না। আমাকে যেখান হইতে আনিয়াছিলে, সেইখানে গিয়া সেই গাছের কোটরে এই হাঁড়ির টুকরাটি ফেলিয়া দিও এবং উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিও।"

রাজকুমার প্রথমে শাহ্‌জাদীর কথামত কাজ করিবেন কিনা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; শেষে ভাবিলেন, করিয়া দেখা যাক না, কি হয়! ইহার মধ্যে যে একটা রহস্য আছে, সে বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। বানরীর কথামত চলিলেই তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিলেন। শাহ্‌জাদী বাস্তবিকই তাঁর কোনও সাহায্য করিতে পারিবে কিনা সে-বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দেহ হইতেছিল বটে, কিন্তু তিনি হাঁড়ির টুকরা লইয়া গাছের কাছে যাওয়াতে কোন ক্ষতি দেখিলেন না। টুকরাটি লইয়া তিনি নগরের বাহির হইলেন ও কিছুক্ষণ খুঁজিয়াই গাছটি বাহির করিলেন। গাছটি একটু অসাধারণ রকমের। একটি খুব বড় পুরাতন বটগাছ, তাহার মোটা শিকড় আর ডালপালা লইয়া গোল হইয়া প্রায় এক মাইল জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছিল এবং তাহার পাতা আর বড় বড় শিকড়ে অনেক রকম বিচিত্র কুঞ্জবনও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার গুঁড়িটা ফাঁপা হইয়া গিয়াছিল ও বেড় একশ গজ ছিল। রাজকুমার গাছের কাছে গিয়া হাঁড়ির টুকরাটি কোটরে ফেলিয়া দিয়া উত্তরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে সবুজ রঙের পোশাক পরা একটি পরমাসুন্দরী রমণী বাহির হইয়া আসিয়া রাজকুমারকে তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল। পরীদের রাণীই তাঁহাকে আসিতে বলিয়াছিলেন। রাজকুমার গাছে উঠিয়া কোটরে ঢুকিলেন। খানিকক্ষণ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইয়া শীঘ্রই আলোতে আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি একটি ছবির মত সুন্দর বাগানে আসিয়াছেন; সেই বাগানের এক কোণে একটি রাজপ্রাসাদ রহিয়াছে। বাগানের গাছগুলি

কাঁচা সোনার, পাতাগুলি মণিমুক্তার। গাছগুলি সব সারি সারি করিয়া সাজানো, আর তাদের মাঝে মাঝে এক-একটি নদী বহিয়া যাইতেছিল। তার জলে এমন সুন্দর গন্ধ যে মনে হয় সেগুলি যেন অমৃতের নদী। নদীর জল এমন নির্ম্মল আর স্বচ্ছ যে জলের নীচে হীরামুক্তাগুলি আর সোনারূপার মাছগুলি সব পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। বুলবুল, কোয়েল প্রভৃতির গানে সারাক্ষণ বাগান ভরিয়া রহিয়াছে; সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ বাতাস গাছের সারির ও কুঞ্জের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। এই পাতালপুরীর আলোও যেন অসাধারণ রকমের উজ্জ্বল এবং তাহার রঙও অসাধারণ রকমের। পাঁচ মিনিট অন্তর আলোর রঙ বদলাইয়া যাইতেছিল। রাজকুমার তাহা দেখিয়া প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি কোন আশ্চর্য্য ধরনের বাজী পোড়ান দেখিতেছেন। বাগানের এক কোণে একটি সোনালী-জল-ভরা মস্ত বড় চৌবাচ্চা ছিল। তাহার জল ফোয়ারার মত হইয়া উঠিয়া চারিদিকে সুগন্ধ ছড়াইতেছিল ও বাতাস সুশীতল করিতেছিল। ফোয়ারার পাশে একটি পাথরের বৈঠকখানা ছিল, তাহার বারোটি দরজা। রাজকুমার সিঁড়ি বাহিয়া ঘরে উঠিলেন। সিঁড়িগুলি সব সোনার তৈয়ারী। ঘরের ভিতর গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া গেলেন। ঘরটি এমন সুন্দর আসবাবে সাজানো ছিল যে, সেরূপ জিনিষ তিনি চক্ষে কখনও দেখেন নাই, এমন কি কখনো কল্পনাও করেন নাই। ঘরের মধ্যে মসনদের উপর একটি অতুলনীয়া সুন্দরী বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাজকুমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া মুগ্ধ নেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়াই রহিলেন। যে জন্য আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। রমণী তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া মধুর স্বরে বলিলেন, 'রাজকুমার, তোমার দরকার কি তা আমি জানি, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। বাড়ী ফিরে যাও, গিয়ে দেখবে যে কালকের মধ্যেই তোমার বাবাকে আর তাঁর দলবলকে অভ্যর্থনা করবার উপযুক্ত সব আয়োজন হয়ে যাবে। আমি আমার চাকরদের সব কাজ করতে বলে দিয়েছি।' রাজকুমার তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আরও একটু বেশী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি শাহ্‌জাদীকে নিজের পাতালপুরী ভ্রমণের সব কাহিনী বলিলেন। সেখানকার অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যের আর সেই সুন্দরী পরীরাণীর কথা ক্রমাগত ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে তাঁহার ঘুমই হইল না। পরী নিজের কথা রক্ষা করিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য সকালে উঠিয়াই তিনি বাহিরে গেলেন। বাহির হইয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন। আগের দিন যেখানটা একেবারে খালি ছিল, এখন সে জায়গা গোলমালে আর লোকজনে ভরিয়া উঠিয়াছে। রাজার প্রাসাদ হইতে তাঁহার প্রাসাদ পর্য্যন্ত দুই সারি গাছ লাগানো রহিয়াছে, তাহাতে অনেক পাকা ফল ঝুলিতেছে ও গাছের সারির দুই পাশ দিয়া নির্ম্মল জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। সোনার আর রেশমের কাজ করা একটি মখমলের গালিচা সেই দুই প্রাসাদের মধ্যের সারা পথ জুড়িয়া পাতা রহিয়াছে; পথের মাঝে মাঝে সুসজ্জিত তোরণ তৈয়ার করা হইয়াছিল। সেইখান হইতে অনেক চিত্র-বিচিত্র পতাকা বাতাসে উড়িতেছে। গাছের ছায়াতে অনেক দোকান বসিয়া গিয়াছিল। সে সকলে ফল, ফুল, গন্ধদ্রব্য, সরবত প্রভৃতি অনেক জিনিষ বিক্রয় হইতেছে।

প্রাসাদের দুই পাশে অনেকগুলি তাঁবু খাটানো হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক রকম বাজী ও খেলা দেখানো হইতেছে। জায়গায় জায়গায় অনেক ছেলেমেয়ে জমিয়া গানবাজনা করিতেছে, কেহ কেহ বা শুনিবার জন্য বসিয়া গিয়াছে। রাজকুমার যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই আরও আশ্চর্য্যজনক ও সুন্দর দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। সেই সব দেখিতে দেখিতে তিনি প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

এই সব দেখিয়া তিনি আবার প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সেখানেও কত নূতন নূতন দৃশ্য দেখিলেন। এক ঘণ্টা আগে বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ ছিল, এখন চারিদিকে কাজকর্ম্মের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা দাসদাসী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় দশ হাজার লোককে খাওয়াইবার মত প্রচুর আয়োজন করা হইতেছে। সোনার পাত্রে সুখাদ্য সকল সাজানো রহিয়াছে। খাবারের ভারে সেগুলি ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, এবং তাহার সুগন্ধে সমস্ত প্রাসাদ ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আয়োজনই দেবতা কি পরীদের উপযুক্ত হইয়াছে। মণিরত্নখচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাড় ছাদ হইতে ঝুলিতেছে, এবং একদল ওস্তাদ বসিয়া গানবাজনা আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে ঘরে ফুলের মালা টাঙানো রহিয়াছে, উহাদের সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

রাজপুত্র যখন এইসব ব্যাপার দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন একজন সুসজ্জিত চাকর দৌড়িয়া আসিয়া খবর দিল যে, রাজা তাঁহার দলবল লইয়া আসিতেছেন। শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাঁহার পিতা ও অন্যান্য অতিথিদের হীরার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সেই ঘরটিই সব চাইতে সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। সেইখানে সকলকে এক বিরাট ভোজ দেওয়া হইল। যখন সকলের খাওয়া শেষ হইল, তখন রাজকুমার সকলকেই নিজের নিজের সোনার থালা, হীরার বাটি প্রভৃতি উপহার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই আশ্চর্য্য দানশীলতা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

রাজা তখন রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বৎস, তুমি আমার থেকেও বেশী এত ধনরত্ন কোথায় পেয়েছ তা আমি জানতে চাই না, এই সব আশ্চর্য্য খাবার কে রেঁধেছে তাও আমি জানতে চাই না,—অবশ্য এমন খাবার আমি কোনকালেই খাইনি; কিন্তু আমি তোমার জীবনের সঙ্গিনীকে দেখে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে চাই।'

রাজপুত্র মাথা নীচু করিয়া বলিলেন, 'যে আজ্ঞা।' এই বলিয়া বানরীকে আনিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এতক্ষণ ইহাই ভয় করিতেছিলেন; কিন্তু এখন আর কোন উপায় নাই; বানরীকেই সকলের নিকট দেখাইতে হইবে। আসল কথা, ছোট ছেলের খেয়াল ও বোকামি সারাইবার জন্যই রাজা ছেলেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাওয়ার এই কৌশলটি স্থির করিয়াছিলেন।

রাজকুমার আস্তে আস্তে শাহ্‌জাদীর ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু দরজা খুলিবামাত্র তাঁর চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল। ঘরটি যেন আলোয় ঝলমল করিতেছিল। সেই আলোর স্রোতের মাঝখানে একটি জমকাল সিংহাসনে সেই পরীদের রাণী বসিয়াছিলেন। বানরীর সন্ধানে রাজকুমার

চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। পরী তাঁহার হতবুদ্ধির মত ভাব দেখিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার, যেদিন আমি পাতালপুরীতে তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকে আমি তোমা ছাড়া আর কারও কথা ভাবিনি। আমি শাহ্‌জাদী বানরীকে দূর করে দিয়ে নিজে এসেছি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে ?'

রাজপুত্র তাঁহার প্রিয়পাত্রীর দুর্গতির কথা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হায় হায়, নিষ্ঠুর নারী, তুমি কি করেছ ? আমি তাকে নিয়ে থাকব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি কি তোমার সুন্দর মুখের জন্য আমাকে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে বল ? তোমাকে প্রথমে দেখে তোমার সম্বন্ধে আমার এর থেকে ভাল ধারণা হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি যে আমার ভুল হয়েছিল।'

পরী হাসিয়া বলিলেন, 'কুমার, আমার রূপ যদি তোমাকে টলাতে না পারে, তা হলে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও একটু ভেবে দেখ। দেখ, তোমার বাবা আর অন্য সব নিমন্ত্রিতদের জন্য এই ভোজের আয়োজন করতে আমি কত কষ্ট করেছি। এমন ভোজ আর এর আগে কোন মানুষে খায়নি, এ কেবল পরীরাই করতে পারে। তুমি যদি আমাকে বিয়ে কর, তা হলে পৃথিবীর যত সুখ আর ধনসম্পদ সবই তোমার হবে।'

রাজকুমার সক্রোধে বলিলেন, 'আমি এসব জিনিষ তোমার কাছে চাইওনি, আর আমার বানরীটিকে কেড়ে নেবার জন্য যে এত ষড়যন্ত্র হয়েছে, তাও আমি জানি না। আমার শাহ্‌জাদীকে ফিরিয়ে দাও, তা হলে আমি চিরকাল তোমার কেনা গোলাম হয়ে থেকে এই ঋণ শোধ করব।' এই বলিয়া তিনি পরীর পায়ে পড়িলেন।

পরীরাণী তখন সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার, আমিই তোমার শাহ্‌জাদী। আমি তোমার সততা পরীক্ষা করবার জন্য বানরীর রূপ ধরেছিলাম। আমার বানরীর চামড়া ঐ কোণে পড়ে রয়েছে।' রাজকুমার সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই শাহ্‌জাদীর চামড়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাঁর আনন্দ আর দেখে কে ?

তখন পরী রাজকুমারের হাত ধরিয়া সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন। তার পর তিনি তিন বার বলিলেন, 'ওঠ, ওঠ, ওঠ।' সিংহাসন তৎক্ষণাৎ শূন্যে ভাসিয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে যেখানে অতিথিরা সকলে বসিয়াছিলেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুত্র তখন নামিয়া সকলের নিকট পরীর পরিচয় দিলেন। রাজা ও অন্যান্য সকলেই যে অবাক হইয়া গেলেন, তা বলাই বাহুল্য ; যাঁহারা বানরী দেখিয়া ঠাট্টা করিবেন বলিয়া কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হতভম্ব হইয়া রহিলেন। রাজা অন্যান্য বধূদের যে-রকম উপহার দিয়াছিলেন, এই বধূকে তাহা হইতে অনেক বেশী দামী জিনিষ দিলেন, এবং শীঘ্রই রাজপুত্রের সত্যবাদিতার এবং পরীর রূপের প্রশংসা নগরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ছোট রাজকুমারের সৌভাগ্য দেখিয়া অন্যান্য রাজকুমারদের ভারি হিংসা হইল। তাঁহার কিরূপে সর্ব্বনাশ করা যাইতে পারে, এই বিষয়ে সকলে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। একদিন ছয় ভাই তাঁহার

নিকটে গিয়া বলিলেন, 'ভাই, তোমার স্ত্রী একজন পরী। পরীরা চঞ্চলতা আর অস্থিরচিত্ততার জন্য বিখ্যাত। আমরা শুনেছি যে পরী আগে যে চামড়াটা পরে তোমার কাছে এসেছিল, সেটা তোমার কাছে আছে। সেটা তুমি কি জন্য রেখে দিয়েছ? বলা তো যায় না, পরীর কখন খেয়াল হবে, আর আবার সে বাঁদরের রূপ ধরে বসবে! তার থেকে বরং এটা পুড়িয়ে ফেল।' ছোট রাজকুমার কিছুক্ষণ বিবেচনা করিলেন, তারপর ভাইদের ফাঁদে পড়িয়া চামড়াটি লইয়া জ্বলন্ত আগুনে ফেলিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ একটা বিকট চীৎকার শোনা গেল; 'পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম' বলিতে বলিতে পরী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার শরীরের চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছিল। ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাজপুত্র ভয়ে বিস্ময়ে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, তারপর ব্যাপার কি জানিবার জন্য ছুটিয়া ঘরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন তিনি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে; পরীর সঙ্গে যে রাজপ্রাসাদ, বাজার এবং অনেক কিছু আসিয়াছিল সবই অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজকুমার তখন নিজের বোকামির জন্য দুঃখ করিতে বসিলেন। রাজা এবং মন্ত্রীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, 'মানুষের সঙ্গে কি কখনো পরীর বিয়ে হতে পারে? তুমি তার জন্য দুঃখ করো না; তিনি বাতাসের জীব ছিলেন, বাতাসেই মিলিয়ে গিয়েছেন। তুমি তাঁর জন্য কেঁদ না।' রাজকুমার কিন্তু কাহারও কথায় কান দিলেন না, কোন সান্ত্বনাই মানিলেন না। রাজা ভাবিলেন, রাজপুত্র দুঃখের চোটে কি জানি কি করিয়া বসেন, হয়ত আত্মহত্যা করিবেন, নয় বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি রাজকুমারের উপর কড়া পাহারা বসাইলেন। রাজকুমার তাঁর নিজের বাড়ীতেই বন্দী হইলেন, ও পরীর খোঁজ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে মনে খুব রাগিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি পাহারাওলাদের ফাঁকি দিয়া নগরের বাহিরে পলায়ন করিলেন। সেখান হইতে সোজা সেই বটগাছের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশা ছিল যে, সেখানে পরীর কোন সন্ধান পাইবেন, কিন্তু সেখানে গিয়া গাছটাছ কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কেবল এক জায়গায় একগাদা ছাই পড়িয়া ছিল। তিনি সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে আর কপালে করাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। বনের ফল ও নদীর জল খাইয়া দিনের পর দিন তিনি চলিতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে খোলা আকাশের তলায়ই শুইয়া থাকিতেন, আর কেবল 'শাহ্‌জাদী, শাহ্‌জাদী' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি বড় বড় বন পার হইয়া শ্রান্ত মনে ক্লান্ত দেহে কেবলি চলিতে লাগিলেন। একদিন দেখিলেন, একটি লোক একপায়ে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে, 'একবার তোমায় দেখেছি, আর একবার দেখা দাও।' রাজকুমার দেখিলেন, সে লোকটিরও তাঁহারই মত দুর্গতি। তাহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, হাত-পা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, চুল আর দাড়ি খুব লম্বা হইয়া মুখের চারিদিকে ঝুলিতেছে। তাহাকে দেখিলেই একটা কঙ্কাল মনে হয়। তাহার চেহারা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া রাজকুমার একটু বিস্মিত হইয়া তাহাকে নিজের কাহিনী বলিতে বলিলেন। লোকটি বলিল, 'হে দয়ালু পথিক, আমি এক রাজার ছেলে। এখানে শিকার করতে এসে আমি নিজের দল-ছাড়া হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় দেখলাম যে, একটি খুব সুন্দরী

মেয়ে এইখান দিয়ে যাচ্ছেন ; তাঁর সমস্ত শরীর আগুনে পুড়ে যাচ্ছে, আর তিনি চীৎকার করছেন, "পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম!" তাঁকে দেখবার পর থেকে আমি এখানে এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছি।' এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিল, 'একবার তোমায় দেখেছি, আর একবার দেখা দাও!'

রাজকুমার তখন বলিলেন, 'আমিই তাঁর হতভাগ্য স্বামী, আমি তাঁকে পুড়িয়েছি। তিনি কোন্ পথে গিয়েছেন ?' লোকটি রাস্তা দেখাইয়া দিল।

তিনি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে বলিল, 'পথিক, তুমি যাতে তোমার খোঁজে কৃতকার্য্য হও, তার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রার্থনা করব। কিন্তু তুমি যখন তাকে পাবে, তখন দয়া করে একবার আমাকে দেখিয়ে যেও। এই লোহার লাঠিটা নাও, তা হলেই তোমার আমাকে মনে থাকবে ; এর একটা গুণ আছে যে, এ সর্ব্বদাই প্রভুর আজ্ঞা পালন করে। তুমি যদি একে কোন লোককে ঠেঙাতে বল, তাহলে এটা তখ্‌খুনি তাকে ছাতু বানিয়ে দেবে। বিপদের সময় এর কাছ থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে।'

রাজকুমার লাঠিটি লইয়া তাকে ধন্যবাদ দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। আরও অনেক মাস ধরিয়া তিনি মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তিনি সব সময়েই 'শাহ্‌জাদী শাহ্‌জাদী' বলিয়া চীৎকার করিতেন। মরুভূমির গরম বালির উপর বেড়াইয়া বেড়াইয়া তাঁহার পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার পর একদিন তিনি গাছে-ঘেরা একটি সুন্দর জায়গা দেখিতে পাইলেন। সেইখানে গিয়া একটি ছোট নদীর জল পান করিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলেন। তিনি বিশ্রাম করিবার জন্য সেখানে একটু বসিয়া আছেন, এমন সময় খুব সুন্দর সেতারের ঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। কে বাজাইতেছে দেখিবার জন্য তিনি চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। শেষে বাদ্যকারকে গাছে-ঘেরা জায়গাটির মাঝখানে দেখিতে পাইলেন ; সে খুব সুশ্রী, তাহার বয়স বছর ত্রিশ হইবে, খুব মন দিয়া সে সেতার বাজাইতেছিল। তাহার বাজনা এমনই মিষ্ট যে সেখানকার যত পশু পক্ষী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া বাজনা শুনিতেছিল। তাহারা এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে ঠিক ছবি বলিয়া মনে হইতেছিল। যুবক কিছুক্ষণ পরে বাজনা শেষ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'একবার তোমায় দেখেছি, আর একবার দেখা দাও!'

রাজকুমার তাহার কথায় একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, 'আমি এক বণিকের ছেলে। আমি একদিন এইখান দিয়ে যেতে যেতে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলাম। তিনি "পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম" বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে চলে গেলেন। তাঁকে দেখার পর থেকে আমি এখানেই বসে আছি। এ ঘটনা প্রায় ছ'মাস আগে হয়েছে।'

রাজকুমার তখন নিজের পরিচয় দিলেন, তিনি যে সেই সুন্দরীর স্বামী এবং তাঁহারই খোঁজে বেড়াইতেছেন, তাহাও বলিলেন। যুবক তখন তাঁহাকে সেই মন্ত্রপূত সেতারটি দিল। তাহার বাজনা যে শুনে সে-ই মুগ্ধ হইয়া যায়, রাজকুমার তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন, এবং কৃতকার্য্য হইলে পরীকে আবার তাহাকে দেখাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে অনেক কঠিন বাধা

অতিক্রম করিতে হইল, অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইল, কিন্তু তাঁহার সাহস কিছুতেই টলিল না। তিনি এমন অনেক বিপদে পড়িলেন, যাহাতে অতি বড় বীরপুরুষও ভয় পাইত, কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না। অনেক মাস পরে তিনি একটি পাহাড়ের কাছে আসিলেন। সেটা এত উঁচু যে দেখিলে মনে হয় তাহার চূড়া আকাশে ঠেকিয়াছে। তাঁহার পথ ঐ পাহাড়ের উপর দিয়া, কিন্তু সেই পাহাড়ের চড়াই আর গভীর খাদগুলি দেখিলেই লোকের মনে ভয় হয়। তার চূড়া সব সময়ই শাদা বরফে ঢাকা থাকে। রাজকুমার পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পাহাড়টি আবার এমন পিছল যে তার উপর চলাই দায়। কিন্তু তিনি চলিতে লাগিলেন, শেষে সবচেয়ে উঁচু চূড়ায় উঠিয়াই শুনিলেন কে যেন কাতর স্বরে বলিতেছে, 'একবার তোমায় দেখেছি, আর একবার দেখা দাও।' এমন জায়গায় কে এ কথা বলিতেছে জানিবার জন্য রাজকুমার চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, শব্দটা কোন্ জায়গা হইতে উঠিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কে তুমি এমন জায়গায় দুঃখের কথা বলছ, আমিও তোমার মত দুঃখী, তুমি আমাকে দেখা দাও।'

এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার সামনে একজন রোগা, বিবর্ণ যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে-ই ঐ কাতরধ্বনি করিতেছিল। রাজকুমার তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'প্রায় এক বৎসর আগে আমি একটি পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলাম, তিনি "পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম" বলে চীৎকার করতে করতে ছুটে চলে গেলেন। তখন থেকে আমি এইখানে তাঁর অপেক্ষায় বসে আছি।'

রাজকুমার বলিলেন, 'আমি হতভাগাই তাঁকে পুড়িয়েছি। আমি এখন তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছি। তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁকে সারাতে চেষ্টা করব।'

পাহাড়ের লোকটি তখন তাঁহাকে একটি টুপি দিয়া বলিল, 'রাজপুত্র, তুমি এই টুপিটা নাও, এটা পরলে আর কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। সেই জন্যই তুমিও আমাকে আগে দেখতে পাওনি। পথে ওটা তোমার কাজে লাগতে পারে।' রাজপুত্র তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন।

পরে তিনি যত উঁচুতে উঠিতে লাগিলেন, তাঁহার পথ ততই কঠিন হইতে লাগিল। শীতে তাঁহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, তাঁহার রক্ত যেন জমিয়া আসিতে লাগিল, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি এই সব কষ্ট ধীর ভাবে সহ্য করিয়া উঠিতে উঠিতে একটি মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরটি আগাগোড়া বরফের তৈয়ারী ; থামগুলি বরফের, কড়ি বরগা সবই বরফের। তিনি ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলেন, ভিতরটি বেশ গরম আর আরামদায়ক। ঘরের মধ্যে এক সন্ন্যাসী যোগমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি মাটি হইতে অনেক হাত উপরে শূন্যে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা ও শরীর হইতে জ্যোতি বাহির হইতেছিল। রাজকুমার তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! কয়েক ঘণ্টা পরে যোগী চোখ মেলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কুমার, আমি তোমার কাহিনী জানি। তুমি যাঁকে খুঁজছ, তিনি পরীর রাজার মেয়ে। ঐ রাজার প্রাসাদ ককেশস্ পাহাড়ের চূড়ায়। রাজকন্যা এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর খুব অসুখ। এই মলমটা নাও, যতই ভয়ানক পোড়া

হোক না, এতে সেরে যাবে। এই খড়ম-জোড়া নাও, এর গুণে তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে।' রাজকুমার মলম আর খড়ম লইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর খড়ম-জোড়া পরিয়াই পরীর দেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি শূন্যে উঠিয়া তীরবেগে পরীদের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নগরের বাহিরে একটা নির্জন জায়গায় মাটিতে নামিলেন।

তার পর সেই টুপি পরিয়া তিনি নগরের ভিতর ঢুকিলেন এবং পরীরাজ্যের যত আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে লাগিলেন। টুপির গুণে তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। কিন্তু তিনি সমস্তই দেখিলেন। নগরটি খুব জমকালো আর প্রকাণ্ড। নগরের লোকেরাও সব অদ্ভুত রকমের, তাহাদের শরীর মানুষের মত হইলেও তাহারা ঠিক মানুষ নয়। তাহারা সকলেই দেখিতে খুব সুন্দর আর ফরসা। রাজকুমার এইসব দেখিতে দেখিতে রাজপ্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে কেউ দেখিতে পাইতেছিল না বলিয়া তিনি অনায়াসে ভিতরের বাড়ীতে ঢুকিয়া সোজা তাঁহার স্ত্রীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজকন্যা পীড়িত আর দুর্ব্বল হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন।

তারপর রাজকুমার নগরের বাহিরে আসিয়া টুপি খুলিয়া ফেলিয়া ফকীর সাজিলেন এবং সেতারটি লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বাজনার শব্দ যেন বাতাসে ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে নগরময় ছড়াইয়া পড়িল, সমস্ত নগর যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। পরীরা সকলে ঐ বাজনা শুনিবার জন্য ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। ফকীরের আশ্চর্য্য সেতার বাজানোর কথা শীঘ্রই পরীরাজের কানে উঠিল। রাজা কথাটা সত্য কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। তিনিও বাজনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তার পর রাজকুমারের সম্মুখে নতজানু হইয়া তিনি বলিলেন, 'যোগীবর, দয়া করে আমার কথা শুনুন। আমার মেয়েকে এক হতভাগা মানুষ পুড়িয়ে দিয়েছে, এইজন্য আমার মেয়ের এখন খুবই অসুখ। আপনি তাকে সারিয়ে দিন। সে আমার চোখের মণি, আমার বুড়োবয়সের একমাত্র সম্বল। আপনি যদি তাকে সারিয়ে দেন, তা হলে আপনি আমার কাছে যা চাইবেন তাই দেব।'

ফকীরবেশী রাজকুমার বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা ঈশ্বরের দাস, কারু বাড়ীতে আমরা ঢুকি না। আপনার মেয়েকে যদি এখানে নিয়ে আসেন, তা হলে আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করে তাঁকে সারাতে পারি।'

রাজা অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'পুণ্যাত্মন, আমার মেয়ে এত বেশী পীড়িত যে তাকে নড়ানো যায় না। তাকে এখানে আনতে গেলে সে মরেই যাবে। আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করুন।' অনেকক্ষণ সাধাসাধির পর রাজকুমার রাজার সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন। অত বেশী সাধাসাধির দরকার ছিল না ; তবে ফকীর মানুষ সহজে রাজী হইলে পাছে কাহারও সন্দেহ হয়, সেই জন্যই এত কাণ্ড। পরীরা তাঁহাকে মহা সম্মানের সহিত কাঁধে করিয়া বহিয়া লইয়া চলিল। তাহারা তাঁহাকে তাঁর স্ত্রীর ঘরে লইয়া গিয়া নামাইল। রাজকন্যা তখন ঘুমাইতেছিলেন। রাজকুমার মলমের কৌটা বাহির করিয়া দাসীদের তাহা ক্ষতস্থানে মালিশ করিতে বলিলেন। তাহা

লাগাইবা মাত্র তাঁহার সব অসুখ সারিয়া গেল, তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তৎক্ষণাৎ নগরে রব উঠিল যে, ফকীর এক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছেন, রাজকুমারীর অসুখ সারিয়া গিয়াছে।

পরী রাজকুমারকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্ক জানা গেলে বিপদ হইতে পারে, এই ভয়ে রাজকুমার তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত করিয়া বারণ করিলেন। রাজা, তাঁহার মেয়ে সারিয়া উঠিয়াছেন শুনিয়া, খুব আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইলেন ; তিনি বলিলেন, 'আপনি এখন যা ইচ্ছা তাই চান।'

রাজকুমার এই কথার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন।'

ফকীরের এই কথা শুনিয়া রাজা বিষম রাগিয়া গেলেন, তিনি চীৎকার করিয়া নিজের চাকরদের বলিলেন, 'এই হতভাগা বেয়াদবকে ধরে কয়েদ কর ; তার কাছে আমি যা-একটু কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম, তার বেয়াদবীতেই তা কেটে গিয়েছে। রাজকর্মচারীরা যেই রাজকুমারকে ধরিতে আসিল, অমনই তিনি টুপি পরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তারপর তিনি নিজের লাঠিকে রাজা ও তাঁর লোকজনদের খুব এক চোট প্রহার দিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পিঠে ধুপধাপ শব্দে লাঠি পড়িতে আরম্ভ করিল। পরীরা এই রকম অদৃশ্য লাঠির কাছে মার খাইয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। শেষে রাজা দয়া ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, 'আপনি দয়া করুন, আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছে। আপনি এখন আমাদের দেখা দিন, আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন।'

রাজকুমার তখন টুপি খুলিয়া বলিলেন, 'আমার ক্ষমতা আপনাদের বোঝাবার জন্য যে আমাকে এমন শক্ত উপায় অবলম্বন করতে হল, এটা খুব দুঃখের বিষয়। এখন আপনার মেয়েকে দিন, আর তাঁর সখী হবার উপযুক্ত তিনটি সুন্দরী মেয়ে দিন। আর আপনি যে প্রতিজ্ঞা ভেঙেছিলেন, তার শাস্তি-স্বরূপ আপনার সব থেকে দামী মণিমুক্তাগুলি দিন। আর আমাদের নিজের দেশে যাবার জন্য পরীদের তৈয়ারী একটি পুষ্পকরথ দিন।' রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের মেয়েকে এবং আরও তিনটি সুন্দরী মেয়েকে একটি সিংহাসনে বসাইয়া লইয়া আসিলেন। রাজকুমারও সেই সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন ও সকলে মিলিয়া তাঁহাদের দেশে উড়িয়া চলিলেন। যে তিনজন তাঁহাকে লাঠি, টুপি আর সেতার দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পথে তিনি তিন বার থামিলেন। তাহারা পরীর সঙ্গে রাজকুমারকে ফিরিতে দেখিয়া খুব খুসী হইল। রাজকুমারের অনুরোধে তাহারা তিনজনে পরীর তিন সখীকে বিবাহ করিল ও যোগী ছাড়া সকলে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

আর সেই ছয় হিংসুটে ভাইয়ের কি হল ? তাহাদের পিতা যখন তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত রাগ করিয়া ছয়জনকেই ত্যাজ্যপুত্র করিলেন। তিনি তাহাদের বন্দী করিতেও আজ্ঞা দিয়াছিলেন ; কিন্তু ছোট রাজকুমারের কথায় ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে তাহাদের কিছু কিছু টাকা দিলেন।

রাজকুমার শামশের জঙ্গের কথা

এক রাজার সন্তানসন্ততি ছিল না। তিনি রাজ্যে সমস্ত সাধু-সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া তাঁহার জন্য পুত্রসন্তান ভিক্ষা করিতে বলিলেন। সাধকের প্রার্থনা বিফল হইল না, রাজার পূর্ণ চন্দ্রের মত রূপবান এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হইতে দেখিয়া রাজা মহা আনন্দিত হইলেন। কত দেবতার পূজা করিলেন, কত দানধ্যান করিলেন; রাজ্যে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। রাজা জ্যোতিষীদিগকে ডাকিয়া পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহারা শিশু রাজকুমার সম্বন্ধে কত শুভ ভবিষ্যৎ-বাণী করিলেন;—তিনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হইবেন, সকল কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিবেন, তাঁহার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে, তাঁহার দীর্ঘ জীবন ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হইবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা রাজাকে এক বিষয়ে সাবধান হইতে বলিলেন; রাজকুমার যেন চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইবার আগে সূর্য্যের মুখ না দেখেন, সেই জন্য তাঁহাকে সাত হাত পুরু দেয়ালে ঘেরা এক দুর্ভেদ্য দুর্গে মানুষ করিতে হইবে। রাজা জ্ঞানীজনের কথামতই কাজ করিলেন। চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া যাইবার পর রাজপুত্র শামশের জঙ্গ একদিন দুর্গের দেয়ালে এক প্রচণ্ড কীল বসাইলেন। সে কীল কি ভীষণ! সাত হাত পুরু দেয়াল চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িল, যেন কে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিয়াছে। তরুণ যুবরাজ কারাগার হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব মুখে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একজন লোক কোদাল হাতে করিয়া রৌদ্রদগ্ধ পাথরের মত কঠিন মাটি খুঁড়িতেছে। শামশের জঙ্গ বলিলেন, 'কি কচ্ছ ভাই? তুমি নিশ্চয়ই খুব বলবান, তা না হলে কোদাল দিয়ে এমন কঠিন পাথুরে মাটি খোঁড়া যায়?'

লোকটি বলিল, 'হাঁ ভাই, আমার জাতে আমিই সব থেকে জোরাল বলে পরিচিত বটে; কিন্তু আমাদের রাজপুত্র হাত দিয়ে সাত হাত পুরু লোহার দেয়াল ভেঙে ফেলেছেন, তিনি আমার থেকেও জোরাল।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'তুমি যাঁর কথা বলছ আমিই সেই রাজপুত্র।'

এই কথা শুনিয়া সেই লোকটি কুমারকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আজ থেকে আমি আপনার শিষ্য ও দাস হলাম। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব।'

রাজকুমার লোকটিকে সঙ্গে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। লোকটির নাম ছিল 'ক্ষীণদেহ'। কিছুদুর যাইবার পর তাঁহারা এক ময়দানে উপস্থিত হইলেন। ময়দানের মাঝখানে ধনুক হাতে করিয়া একজন লোক চীৎকার করিতেছিল, 'সাবধান সাবধান, সরে যাও সরে যাও, তা না হলে ঐ তীরটা এসে গায়ে পড়বে।'

রাজকুমার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অমন যা তা বকছ কেন?'

সে বলিল, 'মশায় আমার নাম ক্ষীণদৃষ্টি। আমি চৌদ্দ বৎসর আগে ঐ তারাটার দিকে একটা তীর ছুঁড়েছিলাম, এখন সেটা ফিরে আসছে। পাছে আপনার গায়ে লাগে, সেই জন্য আমি সাবধান করে দিচ্ছিলাম।' ক্ষীণদেহ ও রাজপুত্র তারা এবং তার দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনটাই দেখিতে পাইলেন না। চৌদ্দ বৎসর আগে ছোঁড়া আশ্চর্য্য তীরের পতন দেখিবার জন্য তাঁহারা সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে একটা জ্বলন্ত উল্কা ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিয়া মাটিতে পড়িল। সেই জায়গাটা কয়েক হাত গর্ত্ত হইয়া গেল। ক্ষীণদৃষ্টি চৌদ্দ বৎসর আগে যে বাণ ছুঁড়িয়াছিল এ সেই বাণ; সে হাজার মাইল উপর থেকে বাণটা পড়িতে দেখিয়াছিল।

এই দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, 'ভাই, তুমি অত দূর তীর ছোঁড়, পৃথিবীর মধ্যে তুমি বোধ হয় সকলের চেয়ে শক্তিশালী, আর তোমার দৃষ্টিশক্তিও সকলের থেকে তীক্ষ্ণ।'

ক্ষীণদৃষ্টি বলিল, 'মশায়, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত আমি নিজেকে সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ মনে করতাম বটে; কিন্তু শামশের জঙ্গ বলে আমাদের এক যুবরাজ আছেন, তিনি সাত হাত পুরু লোহার দেয়াল এক ঘুঁষিতে ভেঙেছেন, তিনি আমার চেয়েও জোরাল।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'তুমি যাঁর কথা বলছ, আমি সেই শামশের জঙ্গ।' এই কথা শুনিয়া ক্ষীণদৃষ্টিও রাজকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল।

রাজপুত্র দুই সহচর লইয়া চলিতে লাগিলেন, চলিতে চলিতে এক মনোরম উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলেন। বাগানটি গাছপালায় পরিপূর্ণ; ফলের ভারে তাহার ডালগুলি যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু মাচার উপর একজন লোক বসিয়া আছে। রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গীদের দেখিয়া সে চীৎকার আরম্ভ করিল, 'বেরোও, বেরোও, আমার ফলগুলি চাইতে এসেছ বুঝি? আমাকে না খেতে দিয়ে মারবে? তোমরা যতই চাও না কেন, একটাও ফল দেব না, একটা ডালপালা কি পাতাও পাবে না।'

বেচারীরা তাহার কথা শুনিয়া অবাক। রাজপুত্র বলিলেন, 'ভয় নেই, আমরা তোমার ফল চাইছি না। আমাদের ক্ষিদে নেই। কিন্তু বল দেখি, এই অসংখ্য ফল নিয়ে তুমি কি করবে? এখানে বেচবার মতন কোনও শহর নেই—আর তোমার কোনও অংশীদারও তো দেখছি না।'

বাগানের লোকটি বলিল, 'আপনাদের কথাবার্ত্তা শুনে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে, কারণ দেখছি আপনারা আমার ফল চাইতে আসেননি। আপনারা আমার কথা শুনে আমায় ছোটলোক মনে করবেন না। আমার নাম হচ্ছে ক্ষীণক্ষুধা। আমি ঠিক চৌদ্দ বৎসর আগে এই গাছগুলি পুঁতেছিলাম। আর এই এত দিন ধরে অনাহারে এগুলির যত্ন করছি। এখন এতে আম, জাম, পেয়ারা, কুল কত রকম ফল ধরেছে। আমি এখন আমার ভোজের জন্য অপেক্ষা করছি। আর বেশী দেরিও নেই, আমি গাছপালা ফল পাতা সব খেয়ে ফেলব। একটু সবুর করে দেখুন, আমি মিথ্যা বলছি, কি সত্যি বলছি।' তাহারা মঞ্চের উপর বসিলেন; আর যেই ঠিক দুপুর হইল অমনই সেই লোকটি ক্ষুধিত দৈত্যের মত গাছগুলির





উপরে

গুটিয়া দেও বণিক্-কন্যার ভগ্নীকে কাঁধে লইয়া আকাশপথে উড়িয়া আসিতেছে।

[রাজকুমার শামসেরজঙ্গের কথা]

নীচে

কি আশ্চর্য্য ! চুনি হঠাৎ একটি সদ্যোজাত শিশু হইয়া গেল'।

[হীরা ও লালের কথা]



হীরা তলোয়ার বাহির করিয়া দস্যুর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

॥ হীরা ও লালের কথা ॥



হীরা মন্ত্র পড়িয়া ছাগলকে তাহার মনুষ্যদেহ ফিরাইয়া দিলেন

॥ হীরা ও লালের কথা ॥

উপর পড়িয়া আগাগোড়া সমস্ত খাইয়া ফেলিল, একটি ঘাস পাতাও বাকি রহিল না।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া রাজপুত্র উদ্যানরক্ষককে বলিলেন, 'তুমি সকলের থেকে বলবান পুরুষ।'

সে বলিল, 'না মশায়, রাজপুত্র শামশের জঙ্গ আমার থেকেও বলবান। তিনি সাত হাত পুরু লোহার দেয়াল কীল মেরে ভেঙেছেন।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'তুমি যার কথা বলছ, আমিই সেই রাজপুত্র।' ক্ষীণক্ষুধা মাটিতে পড়িয়া রাজপুত্রকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহার সহিত ভ্রমণে চলিল।

যাইতে যাইতে তাঁহারা এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইলেন। একজন লোক তীরে বসিয়া আকুল দৃষ্টিতে জলের দিকে চাহিয়াছিল। রাজপুত্র ও তাঁহার তিন সহচর তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে বসে আছ তুমি কে গো?'

লোকটি বলিল, 'আমি ঠিক চৌদ্দ বৎসর আগে এই পুকুর খুঁড়েছিলাম; সেই থেকে এখানে বসে দেখছি বৃষ্টির জলে পুকুরটা ভরে উঠছে। এখন কূলে কূলে ভরে উঠেছে। আমি এখন পুকুর-সুদ্ধ চুমুক দেব। আমার নাম হচ্ছে ক্ষীণপিপাসা।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'তুমি এক পুকুর জল খেতে পার, নিশ্চয় তুমি সকলের চেয়ে শক্তিশালী।'

সে বলিল, 'না মশায়, রাজপুত্র শামশের জঙ্গ আরও শক্তিশালী। তিনি এক কীলে সাত হাত পুরু লোহার দেয়াল ভেঙে ফেলেছেন!' রাজপুত্র আপনার পরিচয় দিবামাত্র ক্ষীণপিপাসা তাঁহার সহচর হইল। সেইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর রাজপুত্র বন্ধুবর্গের সহিত আবার যাত্রা করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক বিশাল নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অসংখ্য দোকান, বাজার, প্রাসাদ ও অট্টালিকা। সমস্তই খোলা পড়িয়া আছে। যত রকম সুখ, সুবিধার জিনিষ হইতে পারে দোকানে সমস্তই রহিয়াছে। নানা রকম সুখাদ্য তাঁহাদের লুব্ধ করিতেছিল, যদিও তখন লুব্ধ করিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কারণ দীর্ঘ পথশ্রমে তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোন দোকানেই রক্ষক ছিল না, ক্রেতাও ছিল না, বিক্রেতাও ছিল না; সমস্ত নগর জনহীন শ্মশানের মত পড়িয়া ছিল। রাজকুমার বন্ধুদের সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক দোকান খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও জনমানবের সাড়া পাইলেন না। কাজেই তাঁহারা মনের সাধে আহার করিয়া নানাপ্রকার মনোহর সামগ্রী তুলিয়া লইয়া চলিলেন। সমস্ত দিন পথে কাটাইয়া রাত্রিকালে তাঁহারা এক জনহীন প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষে বিশ্রাম করিতে ঢুকিলেন। রাত্রি যখন দুপুর, তখন এক চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা দানবের আবির্ভাব হইল। তাহার হাতে এক চৌদ্দ গজ লম্বা লৌহদণ্ড। তাহার পায়ের দাপে সমস্ত ঘর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ছোট মানুষটি গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'শহরের সব লোক খেয়েছি, এখন আবার কোন মানুষের গন্ধ পাই? ওরে, সব বেরিয়ে আয়, আমি তোদের খাব।'

শামশের জঙ্গ তাহার কথা শুনিয়া খোলা তলোয়ার হাতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বামনটার দিকে চাহিয়া বেশ শান্তভাবে বলিলেন, 'তুই কি চাস রে? জানিস আমি শামশের জঙ্গ, এক কীলে সাত

হাত পুরু লোহার দেয়াল ভেঙেছি! আমার সঙ্গে লড়বি তো আয়।'

এই কথা শুনিয়া গুটিয়া দেও (ক্ষুদ্র দৈত্য) মাটিতে পড়িয়া রাজপুত্রের চরণ চুম্বন করিয়া বিনীত স্বরে উত্তর করিল, 'আমি তোমার ক্রীতদাস। আমায় ভৃত্য বলে গ্রহণ কর, তুমি আমার থেকে বলবান। দয়া করে আমায় সঙ্গে রেখো, আমি তোমার দাসত্ব করব।' এই প্রকার একজন সহায় পাইয়া রাজপুত্র মহা খুসী। তিনি গুটিয়া দেওকে সঙ্গী করিয়া লইলেন। তারপর ছয় বন্ধুতে সেই লোকশূন্য লোকালয় ছাড়িয়া অগ্রসর হইলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে কয়েক মাস কাটিয়া যাইবার পর তাঁহারা আর এক প্রকাণ্ড জনপূর্ণ নগরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা শহরের বাহিরে এক সরাইয়ে আশ্রয় লইলেন। সরাইয়ের মালিক বেশ হাসিখুসী ভালমানুষটি ছিল। সে তাঁহাদের আদর করিয়া ডাকিয়া লইল। তাঁহারা বেশ ভাল সময়েই আসিয়াছিলেন; সেদিন এক সুন্দরী ধনী বালিকার সহিত সরাইওয়ালার একমাত্র পুত্রের বিবাহ ছিল। তাঁহারা ছয় বন্ধুতে মিলিয়া মহা আনন্দে বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিলেন। বিবাহ হইবার পর পুরোহিত বরকন্যাকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিলে যখন চারিদিক হইতে নবদম্পতির উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইতেছিল, সেই সময় এক লাল পোষাক-পরা রাজকর্ম্মচারী আসিয়া বরকর্ত্তার কানে কানে কি বলিয়া গেল। লোকটি আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; চারিদিকে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া রাজকুমারের দল তো অবাক। একজন নিমন্ত্রিতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাজকর্ম্মচারী এমন কি বলিয়া গেল যাহাতে এক নিমিষে আনন্দসঙ্গীত করুণ শোকগাথায় পরিবর্ত্তিত হইল!' নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'শুনুন মশায়, প্রায় চোদ্দ বৎসর আগে আমাদের এখানে এক ভীষণ দুর্ঘটনা হয়। এক ভীষণ রাক্ষস এসে রাজত্ব ছারখার করে তুলেছিল। সে যা কিছু সামনে পেত সব গিলে ফেলত। লোকে শহর ছেড়ে চারিদিকে পালিয়ে যেতে লাগল, কাজেই রাজা নিষ্ঠুর দৈত্যের সঙ্গে এক সর্ত্ত করতে বাধ্য হলেন। রাজা প্রতিদিন চল্লিশ মণ রুটি, এক মণ ঘি, আর একটা মানুষ দিতে স্বীকার করলেন। প্রত্যহ আমাদের একজন করে এই রাক্ষসের পেটে যায়। আজ এই বরের পালা পড়েছে। রাজকর্ম্মচারী তার বাবাকে সেই খবর দিতে এসেছিল।'

শামশের জঙ্গ বরকর্ত্তার এই দুঃখের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি সকলের কাছে গিয়া বলিলেন, 'মশায়রা, আপনাদের দুঃখের কোন কারণ নেই, আপনারা আমোদপ্রমোদ করুন। আমি আজ এই বরের বদলে স্বেচ্ছায় সেই রাক্ষসটার কাছে যাব, চিরকালের জন্য শহরের আপদ বিদায় করব।' সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া উঠিয়া বসিলে রাজপুত্র সঙ্গীদের লইয়া রাক্ষসের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখেন সেখানে চার গাড়ী সন্দেশ, মিঠাই, পিঠা, রুটি আর একগাড়ী ঘি রহিয়াছে ছয় বন্ধু পাহারা দিতে লাগিলেন। প্রায় দুপুর রাত্রে এক বজ্রগম্ভীর গর্জ্জন শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে এক রাক্ষস আকাশে মাথা ঠেকাইয়া আসিয়া হাজির হইল। যে পাঁচ বন্ধু রাজপুত্রের সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন তাঁহারা তো ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সব গাড়ীতে ঢুকিয়া রুটির তলায় লুকাইলেন। কিন্তু

শামশের জঙ্গ একাকী নির্ভয়ে খোলা তলোয়ার হাতে রাক্ষসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেটা কাছে আসিবামাত্র রাজকুমার এক লাফে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার নাককানগুলা কাটিয়া পকেটে পুরিয়া, এখন আর রাক্ষসের ভয় নাই বলিয়া, বন্ধুদের বাহির হইতে বলিলেন।

রাক্ষস মরিয়াছে শুনিয়া সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া খুব সাহসের বড়াই করিয়া লম্ফঝম্প আরম্ভ করিল। ক্ষীণপিপাসা রাজপুত্রকে বলিল, 'প্রভু, বলেন তো আমি রাক্ষসটার সমস্ত রক্ত পান করে ফেলি।'

ক্ষীণদৃষ্টিই বা কেন পিছ্‌পা হয়! সে আসিয়া বলিল, 'প্রভু, বলেন তো আমি এই দেহটা এক বাণে এক হাজার মাইল দূরে পাঠিয়ে দিই।'

বিপদ কাটিয়া যাইবার পর প্রত্যেকেই এইরূপে নিজ নিজ শক্তি জাহির করিতে আরম্ভ করিল। রাজপুত্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'বন্ধুগণ, এখন আর তোমাদের শক্তি ও সাহস দেখাবার কোন দরকার নেই। আজ রাত্রে তোমাদের সাহসের যথেষ্ট নমুনা পেয়েছি। চল, এখন ভোর হবার আগে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।' এই বলিয়া সকলে সরাইয়ে ফিরিয়া গিয়া গভীর নিদ্রা আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ভোর হইতে না হইতে রাজার নিকট রাক্ষসের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিল। এই সুখবর শুনিয়া রাজা শহরে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে দৈত্যটাকে মারিয়াছে সে যেন রাজদরবারে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা পুরস্কার লইতে আসে। এত উচ্চ পুরস্কারের লোভে দলে দলে লোক আসিয়া দৈত্য বধ করিয়াছে বলিয়া শপথ করিতে লাগিল। ন্যায়পরায়ণ রাজা মহা বিপদে পড়িলেন। তখন মন্ত্রী আসিয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায় দেখাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আজ সকালে রাস্তায় বেড়াবার সময় সেই দৈত্যের শরীরটা দেখলাম ; মনোযোগ করে দেখলাম যে, তার নাক আর কান দুটা নেই। অতএব যে বাস্তবিকই তাকে মেরেছে সে নিশ্চয়ই রাক্ষসের নাক-কান দেখাতে পারবে, তাহলেই সব বিপদ কেটে যাবে।' তারপর রাজা যখন নাক-কান দেখাইতে বলিলেন, তখন শামশের জঙ্গ ছাড়া আর সকলকেই সরিয়া পড়িতে হইল। রাজা শামশের জঙ্গকে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও কন্যা দান করিতে স্বীকার করিয়া অন্যান্য পুরস্কারপ্রার্থীদিগকে বকিয়া তাড়াইয়া দিলেন। রাজকুমার কিন্তু ধন্যবাদের সহিত তাঁহার পুরস্কার ফিরাইয়া দিলেন। তিনি ক্ষীণদেহকে কন্যা দান ও তাঁহার পাঁচ সহচরকে রাজ্য ভাগ করিয়া দিতে বলিলেন। রাজা তাঁহার কথামত ক্ষীণদেহের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন এবং পাঁচ বন্ধুকে পাঁচটি বিভিন্ন সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

রাজকুমার রাজা ও নিজ বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইয়া একমাত্র গুটিয়া দেওকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস ভ্রমণ ও কষ্ট সহ্য করিবার পর তাঁহারা এক মনোহর বিশাল নগরীতে প্রবেশ করিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা চারিদিকের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন। পথের দুই ধারে পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ দোকানগুলি ও সুসজ্জিত অট্টালিকা সকল দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলেন। অবশেষে

রাজপ্রাসাদের মত মনোহর একটি প্রকাণ্ড গৃহের নিকট আসিলেন। শহরের সকল গৃহকে সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধিতে পরাজিত করিয়া, সেটি সভাসদবেষ্টিত রাজার মত, যেন মাথা তুলিয়া হাসিতেছে। অট্টালিকার দেওয়ালগুলি সব খাঁটি সোনায় গাঁথা, তাহাতে কত হীরা পান্না বসান রহিয়াছে। এমন চমৎকার উজ্জ্বল দৃশ্য তাহারা আর কখনও দেখেন নাই। বারান্দায় উঠিয়া ঘরে ঢুকিবার দরজার দুই পাশে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত মনুষ্যকঙ্কাল ও মাঝখানে একটি বৃহৎ ডঙ্কা দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন। নগরবাসীদের ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইহা এক ধনী বণিককন্যার গৃহ। যে ব্যক্তি তাঁহার চারিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই কঙ্কালগুলি কয়েকজন অকৃতকার্য্য যুবকের দেহাবশেষ। রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া ডঙ্কায় খুব জোরে কয়েক ঘা দিলেন। শব্দে প্রাসাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গৃহের অধিবাসীগণ বুঝিল, বণিককন্যার হস্তপ্রার্থী আর একজন আসিয়াছে। উচ্চ ডঙ্কাধ্বনি শুনিয়া, কাহার এত স্পর্দ্ধা জানিবার জন্য বণিককন্যা তাঁহার দাসীকে পাঠাইলেন। দাসী শীঘ্রই শামশের জঙ্গকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বণিককন্যা এই সুন্দর, সাহসী ও বাক্‌পটু পুরুষকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজকুমারও এই কন্যার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, লাবণ্য ও বুদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহের সর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'কুমার, আমার এই চারিটি সর্ত্ত আছে, শুনুন ; প্রথম, আমি চোদ্দ বৎসর ধরে কত রকম মিঠাই মণ্ডা পিঠে তৈরি কচ্ছি ; এই ঘরে সব জমা আছে ; একলা একজন লোককে এই সমস্ত খেয়ে নিঃশেষ করতে হবে। দ্বিতীয়, আমার প্রাসাদের মাঝখানে ওই যে পুকুর দেখছেন চোদ্দ বৎসরের বর্ষার জল ওতে জমা হয়েছে ; একজন লোককে এই এক-পুকুর জল খেয়ে ফেলতে হবে। তৃতীয় আপনার বাঁ দিকে এই আর-একটা পুকুর দেখছেন, এটায় চোদ্দ বৎসর ধরে জ্বলন্ত আগুনে জল ফুটছে। এক দিনের তরেও এ আগুন নেবেনি। এই জলে এক ঘণ্টা ধরে কোন লোককে স্নান করতে হবে। চতুর্থ, এখান থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে আমার মাসতুতো বোন থাকেন, তাঁকে একদিনের মধ্যে আমার কাছে এনে দিতে হবে। এখন সব শুনলেন তো ? এ সব করতে পারবেন কি ?'

রাজপুত্র বলিলেন, 'চেষ্টা করা যাবে। আপাততঃ আমায় পনের দিন ছুটি দিন।' কুমারীর নিকট বিদায় লইয়া তিনি গুটিয়া দেওকে আর অন্যান্য বন্ধুদের আনিতে পাঠাইলেন। বামন তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া যথাসময়ে সকলকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইল।

রাজপুত্রের নিমন্ত্রণ পাইবা মাত্র সকলেই যাত্রা করিল। পনের দিন ফুরাইবার পূর্ব্বেই তাহারা প্রভুর সম্মুখে হাজির হইল। রাজকুমারের পায়ে পড়িয়া বলিল, 'প্রভু, আপনি আমাদের যে দয়া করেছেন, আমরা জীবনে কখনও তা ভুলতে পারব না, আপনার ঋণ আমরা এ জন্মে আর শোধ করতে পারব না। বলুন আমরা আপনার কি কাজে লাগতে পারি।'

রাজকুমার বলিলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ শক্তির পরীক্ষা হবে। এই সময় তোমরা আমার অনেক কাজে লাগবে।'

তারপর তিনি বণিককন্যার বিষয় সকল কথা বলিলেন যে, এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাঁহার প্রাণ যাইবে। সকলে যথাসাধ্য করিবে স্বীকার করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কুমারের সহিত বণিককন্যার বাড়ী চলিল। তাহারা গৃহে প্রবেশ করিলে সুন্দরী শামশের জঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন তো ?' রাজকুমার সম্মতি জানাইলে কন্যা সেই কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, 'এই সব খাবার খেয়ে ফেলুন।'

রাজকুমার ক্ষীণক্ষুধাকে বলিলেন, 'এইবার তোমার খিদের জোর দেখাবার সময়। এই মিঠাইয়ের পাহাড় নিঃশেষ করে ফেল।'

ক্ষীণক্ষুধা বলিল, 'প্রভু, "সিপ" করব, না "সপ" করব ?' রাজপুত্র এই অদ্ভুত কথার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। সে বলিল, 'হুজুর, "সিপ" মানে হচ্ছে এই ঘরের কেবল খাবারগুলো খাওয়া, আর "সপ" মানে হচ্ছে খাবারের সঙ্গে সঙ্গে থালা, ঘটি, বাটি, তক্তা, পিঁড়ি, এমন কি ঘরখানা সুদ্ধ খেয়ে ফেলা।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'বেশ ভায়া, "সপ"ই করে ফেল।'

এদিকে সমস্ত শহরে সওদাগরের কন্যার গৃহের এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ডের কথা প্রচার হইয়া গিয়াছে। দলে দলে লোকে প্রাসাদের এই অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে আসিতে লাগিল। ক্ষীণক্ষুধা থলিসুদ্ধ খাবার তুলিয়া মুখে ফেলিতেছে, আর এক হাতে এক লম্বা লাঠি দিয়া এক ধাক্কায় গলার ভিতর থলিটা চালাইয়া দিতেছে, আর চারিদিকে বালক বৃদ্ধ সকলেই "বাঃ বাঃ" করিয়া হাস্যধ্বনি করিতেছে। শীঘ্রই সমস্ত মিঠাই মণ্ডা শেষ করিয়া সে থালা বাটি গিলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু এত সাধের সমস্ত গৃহসজ্জা ক্ষীণক্ষুধার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে যাইবে এই ভয়ে বণিককন্যা তাহাকে থামাইয়া দিলেন। তারপর রাজকুমার ক্ষীণপিপাসার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওহে ভায়া, তুমি এখন পুকুরটা শেষ করে ফেল দেখি।'

সে বলিল, 'হুজুর, "নিপ" করব, না "নপ" করব ?'

রাজকুমার বলিলেন, 'বন্ধু, এর মানে কি ?'

বন্ধু বলিল, 'কেবলমাত্র জল পান করলে "নিপ" হয়, আর তার সঙ্গে পুকুরের যত পাঁক মাটি খুঁড়ে খেয়ে ফেললে "নপ" হয়।'

রাজপুত্র বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে "নপ"ই হোক।' যাই না বলা আর ক্ষীণপিপাসা সমস্ত জল শুষিয়া ফেলিয়া তারপর ঘাট সিঁড়ি ঝরণা পাথর সমস্ত উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল। দর্শকগণের প্রশংসাধ্বনি আকাশ পূর্ণ করিয়া তুলিল।

অতঃপর ক্ষীণদেহের পালা; রাজকুমার তাহাকে ফুটন্ত জলে নামিতে বলিল। সে বলিল, "লিপ" করে নাইব, না "লপ" করে ?' তাহার অর্থ জানিতে চাহিলে ক্ষীণদেহ বলিল, 'প্রভু, কেবল এই জলে এক ঘণ্টা স্নান করলে "লিপ" হয়, আর তারপর আগুনে সুদ্ধ স্নান করলে "লপ" হয়।'

রাজকুমার বলিলেন, 'তবে "লপ"ই হোক।' ক্ষীণদেহ ফুটন্ত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কত সাঁতার

কাটিল, ডুব পাড়িল, আরও কত জলক্রীড়া দেখাইল। ঠিক এক ঘণ্টা পরে এক লাথিতে পুষ্করিণীর তলা ফুটা করিয়া নীচের অগ্নিকুণ্ডে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে এক ঘণ্টা কাটাইয়া দর্শকদের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে বাহির হইয়া আসিল।

তারপর রাজপুত্র ক্ষীণদৃষ্টিকে বলিলেন, 'বন্ধু, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারদিকে চেয়ে দেখ কোথায় এই সুন্দরীর বোন আছেন।'

ক্ষীণদৃষ্টি পৃথিবীর চারিদিকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'তিনি এখন এই প্রাসাদের উত্তরে পাঁচ হাজার মাইল দূরে এক মনোহর উদ্যানে রয়েছেন।'

রাজকুমার তখন গুটিয়া দেওকে সেই রাজ্যে উড়িয়া গিয়া তাঁহাকে আনিতে বলিলেন। দৈত্য তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎবেগে যাইয়া সেই উদ্যানে উপবিষ্টা সুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আপনার বোন আপনাকে আনতে পাঠিয়েছেন।' তরুণী তাহাকে একটু বসিয়া জলপান করিতে বলিলেন। সে তাঁহার কথায় রাজী হইলে তিনি তাহাকে অনেক সুখাদ্য খাইতে দিলেন। দৈত্য মহা আনন্দে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যাই না আহার শেষ হওয়া অমনি সে ঘুমে ঢলিয়া পড়িল;—খাদ্যে ঔষধের গুঁড়া মিশান ছিল। এদিকে বামনের দেরি হইতেছে দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত বিরক্ত ও অধীর হইতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বামনের আর দেখা নেই।

আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় রাজকুমারের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সূর্য্যদেবের অস্ত যাইতে আর এক ঘণ্টা মাত্র দেরি, বণিককন্যা বলিলেন, 'কুমার আপনি কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। আপনার দুঃসাহসের পুরস্কারের জন্য প্রস্তুত হোন।'

রাজকুমারের আর কোনও আশা ছিল না, তবু তিনি বেশ শান্ত স্বরেই বলিলেন, 'না না, আমি এখনও বাজি হারিনি; রাত্রি হতে এখনও এক ঘণ্টা আছে—এর মধ্যে সে ফিরতে পারে।'

তারপর তিনি ক্ষীণদৃষ্টিকে, গুটিয়া দেও কি করিতেছে, দেখিতে বলিলেন। ক্ষীণদৃষ্টি উত্তরদিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, 'বাঃ বাঃ, বেশ তো গাছতলায় ঘুম দিচ্ছে। দাঁড়ান, আমি এখনি ওকে তুলছি।' এই বলিয়া সে ধনুক হাতে করিয়া গুটিয়ার দিকে এক তীর ছুঁড়িল। বাণটা সন-সন করিয়া গিয়া নিদ্রিত দৈত্যের কানের কাছে পড়িল। শব্দ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল, সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিল সন্ধ্যা হইতে এখনও এক ঘণ্টা আছে। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীরভাবে সেই মহিলাকে গিয়া তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল। তারপর আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া একেবারে তাঁহাকে কাঁধে ফেলিয়া উড়িয়া আসিয়া বণিককন্যার পায়ের কাছে আনিয়া রাখিল। তিনি তখন রাজপুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছিলেন। এই আকস্মিক ভাগ্যপরিবর্ত্তনে রাজকুমার অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, আর সকলেও খুব আনন্দ করিতে লাগিল। যে মুহূর্ত্তে শামশের জঙ্গের প্রাণদণ্ড হইবার কথা ছিল, সেই মুহূর্ত্তেই বণিককন্যার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হইয়া গেল।

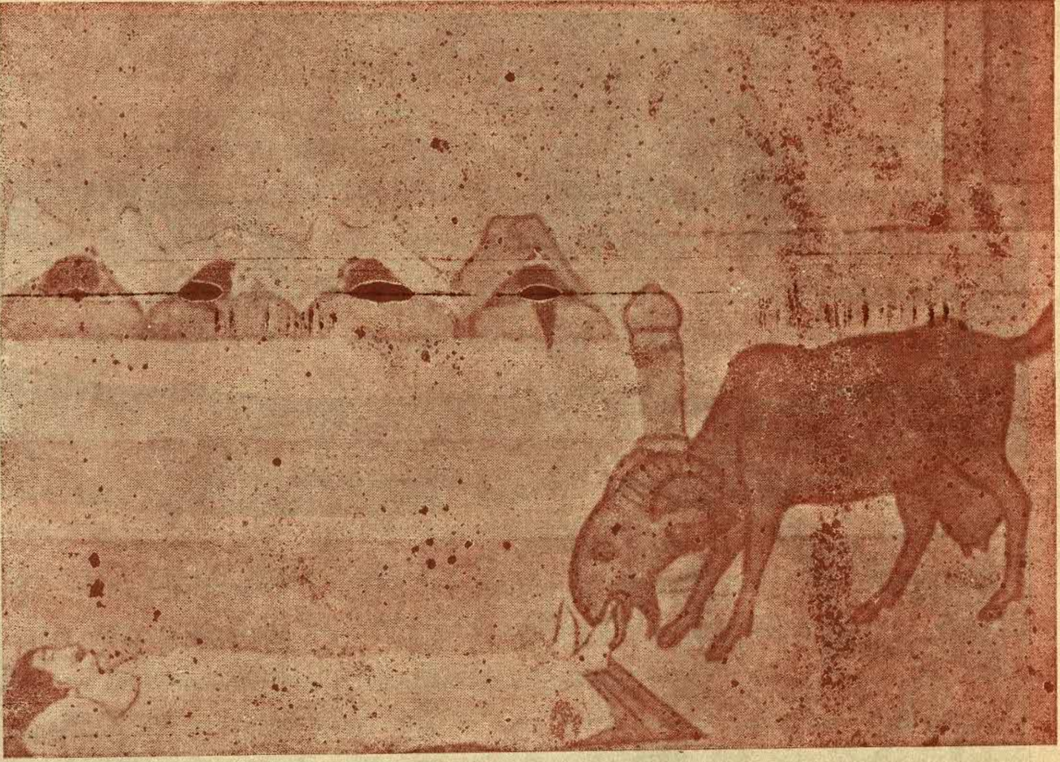
হীরা ও লালের কথা

কোনও নগরে এক গরীব ঘাসিয়াড়া বাস করিত। সে প্রতিদিন জঙ্গল হইতে ঘাস কাটিয়া আনিয়া শহরে দুই-চার পয়সায় বিক্রয় করিত। তাহাতেই অতি কষ্টে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। প্রতিদিনের অভ্যাসমত সে একদিন ভোরবেলায় উঠিয়া শহরের বাহিরে ঘাস কাটিতে গেল। প্রায় দশ সের ঘাস কাটা হইবার পর তার হঠাৎ মনে পড়িল, ঘাস-বাঁধা দড়িটা বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছে। তখন বেচারার যে কি রকম দুঃখ হইল, তা বেশ বুঝিতেই পারিতেছ। সমস্ত দিনের পরিশ্রম একেবারে মাটি! যখন সে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া ভাবিতেছিল, সেই সময় কয়েক পা দূরে দড়ির মতন কি একটা রৌদ্রে ঝক-ঝক করিতে দেখা গেল। সেটা কি দেখিবার জন্য কাছে গিয়া দেখিল, একটা মরা সাপ পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা দিয়া ঘাস বাঁধিতে বেশ সুবিধা হইবে মনে করিয়া সে খুসী হইল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া লইতে গেল; কিন্তু এ কি! তুলিবামাত্র সেটা একটা উজ্জ্বল বহুমূল্য লালপাথর (অর্থাৎ চুনি) হইয়া গেল। হঠাৎ এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বেচারা ঘাসিয়াড়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একটু ভয়ও পাইল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি যত্নে পাথরটিকে পাগড়ীতে বাঁধিয়া লইল। সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বেচারা গরীব মানুষ, চুনির দাম জানিত না; কাজেই এমন সুন্দর জিনিষ রাজার উপযুক্ত মনে করিয়া পরদিন সকালে রাজপ্রাসাদে গিয়া রাজাকে সেটি উপহার দিল। রাজা এমন দামী জিনিস পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া লোকটিকে যথেষ্ট টাকাকড়ি দিলেন। অত টাকা পাইয়া তাহার খুব সুবিধা হইল। জীবনের বাকী ক'দিন তাহাকে ঘাস কাটিতে হইল না।

রাজা চুনি লইয়া অন্তঃপুরে প্রিয়তমা মহিষীকে উপহার দিলেন। রাণী উজ্জ্বল রত্নটি তুলিয়া লইয়া দেখিতে গেলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চুনি হঠাৎ একটি সুন্দর সদ্যোজাত শিশু হইয়া গেল। রাণী দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না; কাজেই তিনি শিশুটিকে অতি যত্নে আদরের সহিত পালন করিতে লাগিলেন। আগে চুনি ছিল বলিয়া রাণী তাহাকে লাল বলিয়া ডাকিতেন। লাল রূপে গুণে বাড়িতে লাগিল। সে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার শরীরে রাজলক্ষণ ও মহত্ত্বের চিহ্নসকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। আট বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতা তাহাকে রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পাঠশালায় হীরা নামে একটি পরমাসুন্দরী রাজকন্যা পড়িত। লাল ও হীরার খুব ভাব হইল; অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা পরস্পরকে খুব ভালবাসিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভালবাসার বন্ধনও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। শেষে একদিন লালের পিতা তাহাদের ভালবাসার কথা শুনিয়া লালকে হীরার সহিত সম্পর্ক ঘুচাইয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন। বেচারা অত্যন্ত দুঃখিত হইল। এদিকে হীরা পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া বিবাহের জন্য বাড়ী চলিয়া গেল। তাহার যে ক্ষমতাশালী

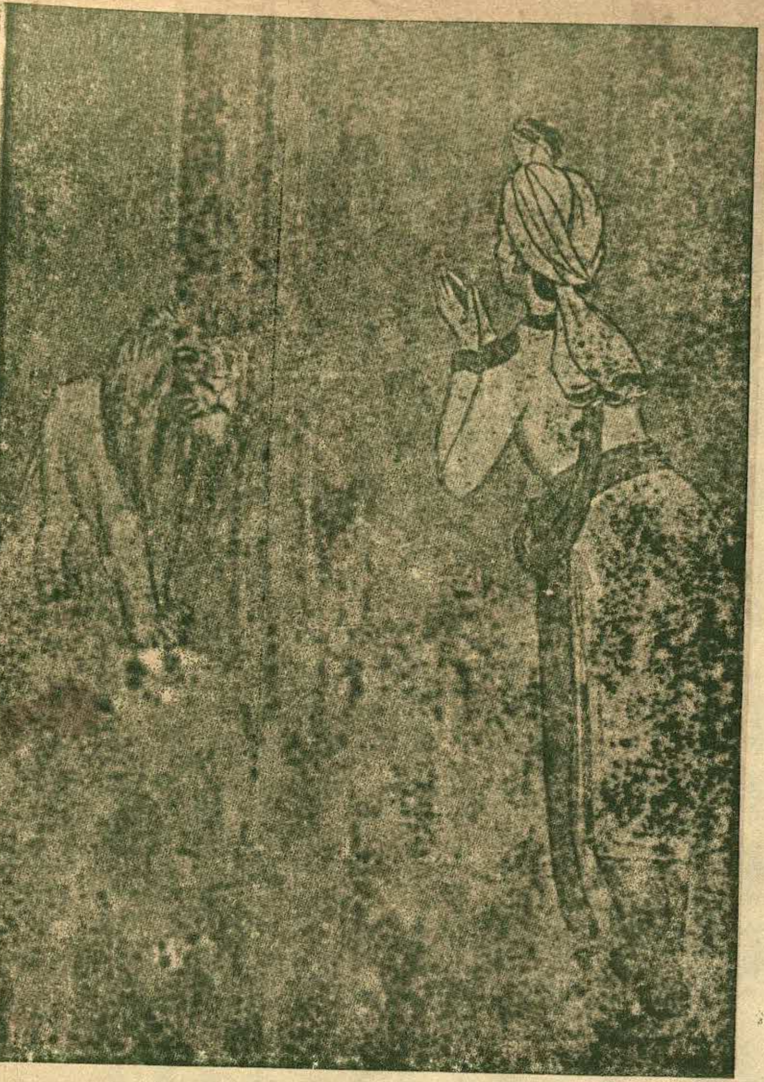
রাজার সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল সে এক কাণা কুঁজো বুড়ো। হীরার বিবাহের কথা শুনিয়া লাল নিরালায় ও দুঃখে পাগল হইবার উপক্রম করিল। একদিন রাত্রে সে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া এক দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া হীরার পিতার রাজ্যে যাত্রা করিল। রাজপুত্র যেদিন শহরে পৌঁছিলেন, সেদিন হীরার বিবাহ। রাজকন্যা হীরা বধূবেশে অসংখ্য সুসজ্জিত লোকের সঙ্গে বাদ্য ও আলোক লইয়া উৎসব-সজ্জামণ্ডিত পথে বাহির হইয়াছেন। লাল পথের এমন জায়গায় দাঁড়াইয়াছিলেন, যেখানে সহজেই লোকের দৃষ্টি পড়ে; হীরা তখনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। উদ্ধার নিকট মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিবাহের মিছিল চলিবার সময় লাল সুবিধা বুঝিয়া হীরার কানে কানে কয়েকটা কথা বলিলেন। শহরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া সকলে আলোকমালা ও বাজি দেখিতে, কেহ বা নটীর নৃত্যগীত শুনিতে, ব্যস্ত হইয়া পড়িল; হীরা সেই অবসরে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া লালের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাড়াতাড়ি বধূসজ্জা খুলিয়া ফেলিয়া হীরা লালের নিকট পুরুষের পোষাক লইয়া পরিলেন। পোষাকের রঙ ও কাট ঠিক লালের পোষাকের মত। পোষাক পরা হইলে হীরাকে কেহ স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝিতে পারিল না। হীরা ও লাল লম্বায় এবং আকৃতিতে প্রায় একই রকম ছিলেন, তাঁহাদের দেখিলে দুটি যমজ ভাই বলিয়া মনে হইত। তাঁহারা ঘোড়ায় চড়িয়া অতি দ্রুতবেগে শহর ছাড়িয়া গেলেন।

দুজনে ক্রমাগতই চলিয়াছেন। ছুটিতে ছুটিতে তেজী ঘোড়ার খুরের তলায় আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, পায়ের শব্দে সমস্ত কানন-ভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হীরা ও লাল তখনও চলিয়াছেন; সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন; আকাশে তারা ফুটিয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। তাঁহারা শহর ছাড়াইয়া অনেক দূর আসিয়াছেন; আর ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। দুই জনে পথের ধারে একটি ছোট্ট কুটীরে আশ্রয় লইলেন। কুটীরে এক বুড়ী থাকিত; সে পথিকদের আদর করিয়া ডাকিয়া লইল। কুটীরটি ছিল দুই মস্ত দস্যুর; তাহারা এই বুড়ীর স্বামী ও পুত্র। তাহারা এখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই; ডাকাতি করিতে গিয়াছে। হীরা ও লাল যে কি রকম বিপদের মুখে পা দিলেন, তাহা তাঁহাদের কল্পনারও অতীত। হীরা পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে বৃদ্ধার দাসী ঘুম পাড়াইবার জন্য তাঁহার পা টিপিতে লাগিল। হীরা প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পায়ে এক ফোঁটা জল পড়িল; চাহিয়া দেখিলেন দাসী কাঁদিতেছে। হীরা যতই তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, দাসী ততই কাঁদে। অনেকক্ষণ পরে সে চুপি চুপি বলিল, 'তোমরা যে বাড়ীতে এসেছ, তা দুই নিষ্ঠুর দস্যুর; তারা এখন চুরি করতে বাইরে গিয়েছে, শীঘ্র ফিরে এসে তোমাদের দুজনকেই খুন করবে।' এই কথা শুনিয়া হীরা একলাফে উঠিয়া লালের নিকট হাজির হইলেন ও তাঁহাকে সব কথা বলিলেন। শীঘ্রই তাঁহারা বুড়ীর কাছে বিদায় লইয়া অন্ধকারে কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তাহাদের অনেক করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, 'ভয়ানক অন্ধকার, রাত্রি অনেক হয়েছে, পথে কত বিপদ।' কিন্তু কে কার কথা শুনে? হীরা ও লাল চলিয়া গেলেন। তাহারা আর ফিরেন না দেখিয়া বৃদ্ধা, 'পাখী



ছাগলী রাক্ষসী সেকরার রক্ত খাইতেছে । ॥ সাত সেকরার কথা ॥





রাজপুত্র বলিলেন, 'কি মামা, কেমন আছ ? সিংহ তো অবাক্ !
॥ সাত সেকরার কথা ॥



'ওগো, তুমি কি নিষ্ঠুর, আমাকে কিসের জন্য ত্যাগ করলে ?
॥ সাত সেকরার কথা ॥

উড়ে গেল, পাখী উড়ে গেল', বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের পিছনে ছুটিল। তাহার স্বামী ও পুত্র তখন বাড়ী ফিরিতেছিল। চীৎকার শুনিয়া সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া তাহারা পলাতক হীরা ও লালের পিছনে দৌড়িল। লাল দুইজনকে পশ্চাৎ লইতে দেখিয়া এক তীর ছুঁড়িলেন। দস্যুপুত্রের বুক ফুঁড়িয়া বাণ ছুটিয়া দূরে গিয়া পড়িল। সে মরিয়া পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ফিরিল। এদিকে হীরা ও লাল এক সরাইয়ে গিয়া রাত্রির মত আশ্রয় লইলেন। সকালে উঠিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধ দরজায় বসিয়া আছে। সে তাঁহাদের সহিস হইতে চাহিল। লাল তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রৌদ্র উঠিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। একটি নির্জ্জন জায়গায় আসিলে বৃদ্ধ এক ঘায়ে লালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। লালকে মারিয়া সে হীরার মাথা কাটিতে তলোয়ার তুলিল। কিন্তু হীরা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, তিনি যে পুরুষ নন রমণী তাহা বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। এই বৃদ্ধ আর কেহ নয়, সেই মৃত দস্যুর পিতা। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর সে হীরার কথায় সম্মত হইয়া তাহাকে লইয়া কুটীরের দিকে ফিরিয়া চলিল। কয়েক মিনিট যাইবার পর হীরা আকাশের দিকে চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ হাসি দেখিয়া খুব বিরক্ত হইয়া উঠিল। হাসি-তামাসা তাহার সহ্য হয় না। সে বলিল, 'এই ছুঁড়ী, হাসছিস কেন রে ? দাঁত বন্ধ কর্ বলছি !'

কিন্তু হীরা আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ দেখ, কি সুন্দর ঘুড়ী।' সে উপর দিকে চাহিবামাত্র হীরা তলোয়ার বাহির করিয়া চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখে থুথু ফেলিয়া হীরা মৃত লালের নিকট ফিরিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি লালের মৃতদেহের উপর পড়িয়া করুণ সুরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পথিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই পথে হরপার্ব্বতী যাইতেছিলেন। হীরাকে কাঁদিতে দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটি কাঁদছে কেন ?"

শিব বলিলেন, 'দেবি, সকল অশ্রুমুখী বালিকার কান্নার কারণ শুনলে তোমার কোমল হৃদয় মানবের দুঃখে ভেঙে পড়বে।' কিন্তু পার্ব্বতী হীরার বিলাপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার দুঃখের কারণ শুনিয়া তাহা মোচন না করিয়া আর এক-পাও নড়িবেন না। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া শিব কি আর করেন, লালের মৃত্যুকথা বলিলেন। তারপর তাঁহার দেহ ও মস্তক একসঙ্গে করিয়া তাহাতে নিজ শরীরের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। দেবতার রক্ত অমৃত, কাজেই লাল বাঁচিয়া উঠিলেন। হীরার আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার আর সীমা রহিল না। তিনি দেবদম্পতির সম্মুখে পড়িয়া তাঁহাদের বন্দনা আরম্ভ করিলেন। উঠিয়া দেখেন, তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

হীরা ও লাল আবার ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহারা এক বৃহৎ জনাকীর্ণ নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সরাইয়ে হীরাকে রাখিয়া লাল বাজার করিতে গেলেন।

এক মস্ত রাস্তায় গিয়া প্রত্যেক দোকানেই কিছু কিছু কিনিলেন, কিন্তু দোকানের জিনিষ দোকানেই রাখিয়া বলিলেন, 'ফিরবার সময় নিয়ে যাব।'

এইরূপে দোকানের পর দোকানে গিয়া জিনিষ কিনিয়া টাকা দিতে দিতে চলিলেন। অবশেষে পথের শেষে এক পানের দোকানে আসিলেন। পানওয়ালী ছিল যাদুকরী। তাহার কাছে গিয়া লাল পান চাহিলেন। সে বলিল, 'আসুন আসুন মশায়, আপনি যত চান তত দেব।' লাল তাহাকে চিনিতেন না, কাছে যাইবামাত্র মায়াবিনী তাঁহাকে ছাগল বানাইয়া ফেলিল।

এদিকে হীরা লাল আসেন না দেখিয়া খোঁজ করিতে চলিলেন। তিনি তখনও পুরুষের পোষাকই পরিয়া ছিলেন। লাল যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে যাইবামাত্র দোকানদারেরা তাঁহাকে লাল মনে করিয়া তাঁহার ক্রীত দ্রব্যসকল দিতে আসিল। হীরা বলিলেন, 'ফিরিবার সময় নেব।' যাইতে যাইতে প্রত্যেক দোকানদারই কিছু না কিছু দিতে আসিল। প্রত্যেককেই এক উত্তর দিলেন। পানওয়ালীর দোকানে আসিলে সে তাঁহাকে কিছুই বলিল না। হীরা তখনই ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইলেন যে লাল এখানেই আছে। কাজেই তিনি পানওয়ালীর কাছে পান চাহিতে গেলেন। সে বলিল, 'আসুন আসুন, মশায়, আপনি যত চান, আমি তত দেব।' হীরা, 'আমি তার মতন বোকা নয়' বলিয়া চলিয়া গেলেন। এক রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখেন এক বুড়ী মিঠাই তৈয়ার করিতে করিতে কাঁদিতেছে। হীরা তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি কাঁদছ কেন? আর এই মিঠাইগুলোই বা কেন করছ?'

বৃদ্ধা বলিল, 'কি আর বলব বাছা? এ এক দুঃখের কাহিনী। এ দেশের রাজার এক মেয়ে আছে, তাকে প্রতিদিন একটা মানুষ উৎসর্গ করতে হয়। আজ আমার ছেলের পালা। এই মিঠাইগুলি তারই জন্য এবং আমি তারই জন্য কাঁদছি।'

হীরা বলিলেন, 'মা, কেঁদো না, আমি তোমার ছেলের বদলে সেই ভীষণ রাজকন্যার কাছে যাব। এখন আমায় মনের সাধে মিঠাইগুলি খেতে দাও।' বৃদ্ধা এত সহজে পুত্রের উদ্ধার হইল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া হীরাকে সমস্ত খাবার সাজাইয়া দিল। হীরা মনের সাধে খাইয়া রাজপ্রাসাদে চলিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার মহলে পাঠাইয়া দিল। হীরা পুরুষবেশে গিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বীর যুবক মনে করিয়া অত্যন্ত সমাদর করিল। রাজকন্যা যথেষ্ট ভালবাসা দেখাইলেন। হীরা কিঞ্চিৎ আহার করিবার পর এক পুরোহিত আসিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল। তারপরে দুইজনে এক নিভৃত শয়নকক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রাজকন্যার সে অমায়িক মনোহারিণী মূর্ত্তি কোথায় গেল? এ কি ভীষণ মূর্ত্তি; রাজকুমারীর মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখ দিয়া আগুন ছুটিতেছে, যেন দুটা জ্বলন্ত আগুনের ভাঁটা! সে দুই হাতে তার অমন সুন্দর চুল গোছা গোছা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল, মাটিতে পড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। শেষকালে গর্জ্জন কিছু কমিলে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এমন সময় একটা ভীষণ বিষধর কাল সাপ তাহার বাঁ পা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। সাপটা বিকট গর্জ্জন করিয়া হীরার গায়ে পড়িতে আসিল। তার কি

ভয়ানক চেহারা! প্রকাণ্ড দুই জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হীরা যদিও ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধি হারান নাই। সাপটাকে কাছে আসিতে দেখিয়া ক্ষুরধার তলোয়ার দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তারপর হীরা সারারাত্রি সেই ঘরে বসিয়া মূর্চ্ছিতা রাজকন্যাকে সচেতন করিতে ব্যস্ত রহিলেন। পরদিন রাজার নিকট খবর পৌঁছিল, এতদিন যে সাপটা রাজকন্যাকে পাইয়া বসিয়াছিল, হীরা নামক এক বীর যুবা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মহা খুসী! হীরাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি পুরস্কার চাও?' হীরা একদিনের জন্য সেই শহরের রাজা হইতে চাহিলেন। রাজা মহা আনন্দে হীরার মাথায় মুকুট ও হাতে দণ্ড দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। রাজার হুকুমে সমস্ত কর্ম্মচারী তখনকার মত হীরার অধীন হইল।

হীরা সিংহাসনে উঠিয়া শহরে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন, 'রাজার হুকুম, নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে নিজ নিজ গরু-বাছুর পশুপক্ষী লইয়া মহারাজের নিকট হাজির হইবে।' সকলে নিজ নিজ পালিত পশুপক্ষী লইয়া রাজদরবারে ছুটিল। সকলে সমবেত হইলে নাম ডাকা হইল, কিন্তু এ কি! পানওয়ালী যে আসে নাই। পেয়াদারা ছুটিয়া গিয়া পানওয়ালী ও তাহার ছাগল বাঁধিয়া আনিল। হীরা দেখিয়াই বুঝিলেন, এই ছাগলই লাল। মায়াবিনীকে ছাগল বিক্রয় করিতে বলিলেন। সে উত্তর করিল 'ধর্ম্মাবতার, আমি মা কালীকে ছাগলটা উৎসর্গ করেছি, আগামী অমাবস্যায় বলি দেব। মহারাজ, আমি মানত করে রেখেছি, দাসীকে এজন্য ক্ষমা করবেন।'

এই কথা শুনিয়া হীরা আদেশ করিলেন, 'জল্লাদ, এই মায়াবিনীকে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মার।' রাজার আদেশে পানওয়ালী তৎক্ষণাৎ বাঁধা পড়িল। তারপর তাহার প্রাণদণ্ড হইল। হীরা মন্ত্র পড়িয়া ছাগলটাকে আবার মানুষ করিয়া তুলিলেন। সভার মাঝখানে তিনি লালকে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন এবং রাজবেশ খুলিয়া রমণীর বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

হীরা পুরুষ নয় দেখিয়া রাজকন্যা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে লালের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এইরূপে লাল দুই স্ত্রীর সহিত সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকন্যা হীরাকে বলিলেন, 'বোন, আমাদের প্রিয়তম স্বামীর জাত কি বল না? তিনি রাজার পোষ্যপুত্র তা তো জানি, কিন্তু তাঁর জন্মের মধ্যে একটা কি রহস্য আছে। তোমাকে তিনি বেশী ভালবাসেন, এই কথাটা তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

হীরা বলিলেন, 'আমাদের সে কথায় কাজ কি বোন? আমরা তাঁর ভালবাসা পেয়েই কি যথেষ্ট সুখী নয়? তাঁর মুখের স্নিগ্ধ কিরণেই আমরা স্নিগ্ধ হয়ে আছি। আমাদের আর কিসের দরকার?'

কিন্তু রাজকন্যা কোন কথাই শুনিবেন না, তিনি লালের জাতি জানিবার জন্য অত্যন্ত জেদ আরম্ভ করিলেন। শেষে হীরা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। হীরা লালের নিকট গিয়া তাঁহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলেন। লাল ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, 'হীরা, আমায় ওকথা জিজ্ঞাসা কোরো না। এর জন্যে তোমায় পরে দুঃখ পেতে হবে।'

কিন্তু হীরার শুনিতেই হইবে। লাল তখন হীরাকে লইয়া এক নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন ; নদীর ঠিক কিনারায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখনও আমার জাত জানতে চাও ?'

হীরা বলিলেন, 'চাই।'

লাল এক হাঁটু জলে নামিয়া বলিলেন, 'এখনও কি তুমি আমার জাত জানতে ইচ্ছুক ?'

হীরা বলিলেন, 'হাঁ প্রভু।' লাল আরও গভীর স্থানে এক গলা জলে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'এখনও আমার জাত জানতে ইচ্ছা আছে ? বল, এখনও আশা আছে।'

কিন্তু হীরা পূর্ব্বের মতন বলিলেন, 'হাঁ, জানতে চাই।'

লাল গভীর জলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর জলের ভিতর, কেবল চুলের ডগাগুলি জলের উপরে দেখা যাইতেছে। জলের ভিতর হইতে লাল বলিলেন, 'হীরা, এখনও কি তোমার ইচ্ছা দূর হয় নাই ? সাবধান ! এখনও সময় আছে, তা' না হলে চিরজীবন দুঃখ পাবে।' জলের ভিতর হইতে লালের কণ্ঠস্বর এমন গম্ভীর শুনাইতেছিল, যেন তিনি আর ইহলোকের অধিবাসী নন।

হীরার প্রতিজ্ঞা টলিল না, তিনি বলিলেন, 'আমি জানতে চাই।' কথাগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র লালের কালো চুল কয়গাছিও অদৃশ্য হইয়া গেল ; তার স্থানে, এ কি ! এক মুহূর্ত্ত আগে যেখানে লাল দাঁড়াইয়া ছিলেন, যেখানে লালের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল, সেখানে প্রকাণ্ড কালো একটা সাপ ভাসিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত জলের উপর ভাসিয়া সাপটাও অদৃশ্য হইয়া গেল। হীরা লালের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কতক্ষণ কাটিয়া গেল, লাল আর দেখা দিলেন না। তিনি আর নাই ! হীরা করুণ কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন ; এতক্ষণে তিনি নিজ দুঃখের পরিমাণ বুঝিয়াছেন। তাঁহার কান্না শুনিলে পাষাণও গলিয়া যায়। জীবনের বাকি দিনগুলি হীরা কাঁদিয়া কাটাইলেন। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনার এই ফল।

সাত সেকরার কথা

এক শহরে সাত সেকরার এক কারখানা ছিল। তাহারা খুব ভাল কাজ করিত বলিয়া তাহাদের খুব নাম ছিল। একদিন এক ধনী সামন্ত তাঁহার স্ত্রীর গহনা তৈয়ার করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঐ সামন্তের দুর্গ শহর হইতে অনেক দূরে। তাহারা সাত বন্ধু সকাল সকাল বাহির হইয়া অনেক ভয়ানক বন পার হইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর কর্ত্তা নিজে আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া একটি বড় ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাদের কাজের জন্য যা যা দরকার, সব সাজান রহিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তার চেহারা এমন রুক্ষ ও বিকট যে সেকরারা তাঁহাকে ডাকাত ভাবিয়া প্রথমে খুব ভয় পাইয়াছিল। তাহারা তখনই কাজ করিতে অস্বীকার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সামন্ত

তাহাদিগকে খুব টাকার লোভ দেখাইতে লাগিলেন। শেষকালে তাহারা লোভে পড়িয়া বুদ্ধি-বিবেচনা হারাইয়া ঐ বাড়ীতে থাকিয়া গহনা তৈয়ার করিতে রাজী হইল। বাড়ীর কর্ত্তা তখন তাহাদিগকে প্রথম ঘরে চুলা, ফুঁকনল, কয়লা প্রভৃতি তাহাদের কাজের সব বন্দোবস্ত ও সরঞ্জাম দেখাইয়া দিয়া আর একটি ছোট ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি খাট আর একটা ছাগলী ছিল। তিনি বলিলেন, 'এটা তোমাদের শোবার ঘর, আর যে ঘরটা দেখে এলে ওখানে তোমরা কাজ করবে। কাজ-কর্ম্ম হয়ে যাবার পর এই ঘরে এসে এই ছাগলীর দুধ খেয়ে এই খাটে শুয়ে ঘুমিও। এটাতে তোমাদের সকলেরই জায়গা কুলোবে। ছাগলীর দুধ ছাড়া তোমরা আর কোনো খাবার পাবে না। তাই বলে ভেবো না যেন যে সেটা কোনো রাজভোগের থেকে কম পুষ্টিকর। এর দুধ খেলে গায়েও খুব জোর হয় আর বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ হয়। এ তোমাদের সাতজনের মত যথেষ্ট দুধ দেবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, সাত দিনের মধ্যে তোমাদের কাজ শেষ করতে হবে। যাও, এখন গিয়ে কাজ আরম্ভ কর।'

সেকরারা কর্ত্তামশায়ের নবাবী ধরণের চালচলন আর তাদের খাইবার শুইবার বন্দোবস্ত বিশেষ পছন্দ করিল না। যা'হোক তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া তাহারা অনেক কাজ সারিয়া ফেলিল। তাহাদের মনে আশা হইল যে সাত দিনের আগেই কাজ শেষ করিতে পারিবে। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে তাহারা ছোট ঘরে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া ছাগলীর দুধ দুহিয়া খাইতে বসিল। দুধ চাখিয়াই বুঝিল যে গৃহস্বামী কোন কথা বাড়াইয়া বলেন নাই। দুধ এত মিষ্ট আর সুস্বাদ যে তাহারা অমন জিনিষ জন্মে কখনও খায় নাই। দুধ খাইয়াই তাহাদের মনে খুব স্ফুর্ত্তি হইল, তারপর ঘুম আসাতে তাহারা শুইতে গেল। কিন্তু খাটে ছ'জনের বেশী লোকের কিছুতেই জায়গা হইল না; কাজেই ছ'জন খাটে শুইল, আর-একজনকে বাধ্য হইয়া মাটিতে শুইতে হইল।

মাঝ-রাত্রে ছাগলীটা উঠিয়া, যে সেকরা মাটিতে শুইয়াছিল, তাহার পা চাটিতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত শুষিয়া লইল। বেচারা কোন শব্দ না করিয়াই মারা গেল। তখন হঠাৎ একটা বাজ-পড়ার শব্দ হইল, আর ঘরটা নীল রঙের আলোতে ভরিয়া উঠিল। কর্তা তখন ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'বোন, তুমি কি খুসী হয়েছ, তোমার ক্ষিদে কি গিয়েছে?' ছাগলী বলিল, 'ভাই রাক্ষস, যতক্ষণ তুমি আমায় খুসী রাখবে ততক্ষণ আমি খুসীই থাকব, যতক্ষণ আমাকে মানুষের রক্ত দেবে ততক্ষণ আমার ক্ষিদেও মিটবে।' তারপর আবার বাজ-পড়ার শব্দ হইল, সেকরার দেহ ও সামন্ত দুইই ঘর হইতে অন্তর্হিত হইল।

সেকরারা তার পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিল যে তাহাদের মধ্যে একজন নাই। তাহারা সারা বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইল কিন্তু তাহাকে কোথাও পাইল না। তাহাদের মনে কি একরকম আতঙ্ক ও সন্দেহ হইল। তবুও তাহারা কাজ আরম্ভ করিল। সামন্ত আজও তাহাদের বলিয়া গেলেন যে সাত দিনের মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে এক দিন কাটিয়া গিয়াছে, আর ছ'দিন বাকী। ছয়জনে মিলিয়া আগের দিনের চাইতে ঢের বেশী পরিশ্রম করিল, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা এক মুহূর্ত্তও

বিশ্রাম করিল না। কিন্তু একজন কম থাকাতে আগের দিনের মত অত বেশী কাজ হইয়া উঠিল না। তবুও তাহারা আশা করিল যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিতে পারিবে। রাত্রিবেলা তাহারা ছাগলীর দুধ খাইয়া শুইতে চলিল। দুধ খাইবামাত্রই তাহাদের আগের মত অত্যন্ত ঘুম পাইল, কিন্তু খাটের কাছে গিয়া তাহারা দেখিল যে সেটা একদিনে আরও ছোট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর পাঁচজনের বেশী লোক ধরে না। কাজেই এ রাত্রেও একজনকে মাটিতে শুইতে হইল। দুধের এমন গুণ যে, শুইবামাত্র তাহারা সকলে অজ্ঞান হইয়া গেল। মাঝ-রাত্রে আবার ছাগলী পা চাটিয়া চাটিয়া রক্ত চুষিয়া লইয়া ভূমিশায়ী সেকরাকে মারিয়া ফেলিল। ঠিক আগের মত গৃহস্বামী ঘরে আসিয়া ছাগলীর সঙ্গে কথা বলিল, আর বাজ-পড়ার শব্দ হইয়া সেকরার দেহ আর সামন্ত দুই মিলাইয়া গেল।

তার পরদিন বন্ধুরা উঠিয়া দেখিল, তাহাদের মধ্যে আরও একজন নাই। অনেকক্ষণ বৃথা খোঁজা-খুঁজি করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়া কাজে বসিল। কিন্তু এইরকম অদ্ভুতভাবে দুইজন সঙ্গীকে হারাইয়া তাহারা খুব ভয় পাইয়া গেল। তবুও টাকার লোভে তখনও কাজ ছাড়িতে পারিল না; ঐ ধনী সর্দ্দার পাছে রাগ করে, সে ভয়ও ছিল। কিন্তু প্রাণপণে খাটিয়াও পাঁচজনে সাতজনের কাজ করিয়া উঠিতে পারিল না। রাত্রে তাহারা যখন শুইতে গেল, তখন খাটখানা আরও ছোট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মোটে চারজনের জায়গা হইল। সেরাত্রেও তাহারা এক বন্ধুকে হারাইল। এই রকমে রোজ রোজ এক-একজন করিয়া কমিতে লাগিল। ছয় দিনের দিন মোটে দু'জন বাকি রহিল। তাহারা দু'জনে বলিল, 'ভাই, আমরা আজ টিকিতে টিকিতে গেরো বেঁধে শোব, যাতে একজনকে নিতে এলেই আর একজন জেগে যায়।' সেরাত্রে শুইবার সময় খাটে কেবল একজনকে কুলাইল। অন্যজন মাটিতে শুইল, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে নিজের টিকি বাঁধিয়া রাখিল। মাঝ-রাত্রে ছাগলী আবার রক্ত চুষিয়া দ্বিতীয় সেকরাকে মারিয়া ফেলিল। সর্দ্দারও ঘরে ঢুকিয়া ছাগলীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বোন তুমি খুসী হয়েছ তো? তোমার পেট ভরেছে তো?' ছাগলী আগের মত বলিল, 'ভাই রাক্ষস, তুমি যতক্ষণ আমাকে খুসী রাখবে, ততক্ষণ আমি খুসীই থাকব। যতক্ষণ আমাকে মানুষের রক্ত দেবে, ততক্ষণ আমার পেটও ভরবে।' বাজ-পড়ার শব্দের সঙ্গে মৃতদেহ ও সামন্ত উভয়েই মিলাইয়া গেল।

ছাগলী যখন রক্ত চুষিতেছিল, তখন যে সেকরা খাটে শুইয়াছিল, টিকিতে টান পড়াতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। যাহা যাহা ঘটিল সমস্তই সে শুইয়া দেখিল ও শুনিল। বাড়ীটা রাক্ষসের আর তারা মানুষের রক্তমাংস খায় বুঝিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সকাল হইবামাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিবার ছল করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে প্রাণপণে দৌড় দিল। ছাগলী তখনই তাহার পলায়নের কথা জানিতে পারিল ও একটি সুন্দরী মেয়ের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও; আমি যে তোমার স্ত্রী, আমাকে পিছনে ফেলে যেও না।' কিন্তু সেকরা বেশ বুঝিতে পারিল যে এসবই মায়াকান্না, সুন্দরীটি আসলে এক রাক্ষসী; সে আরও জোরে ছুটিতে আরম্ভ করিল। পথে সে একটি গাছ দেখিতে পাইল,

সে গাছটির দেবতা শিব। সে তাড়াতাড়ি গাছে উঠিয়া মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে বাবা ভূতনাথ মহাদেব, তুমি আমাকে এই ভয়ানক রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা কর।' শিব তাহার প্রার্থনা শুনিলেন। রাক্ষসী গাছের কাছে আসিয়া দেখিল যে সেকরা গাছের উপরে বসিয়া আছে। সে লাফ দিয়া গাছে উঠিতে গেল, কিন্তু কিছুতেই উঠিতে পারিল না। তখন সে গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ওগো তুমি কি নিষ্ঠুর, আমাকে কিসের জন্য ত্যাগ করলে ? তুমি শিগগির নেমে এস, আমি ভয়ে গাছে উঠতে পারছি না, তা না হলে আমিই তোমার কাছে যেতাম।' এই রকম করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সে নিজের বুক চাপড়াইতে ও চুল ছিঁড়িতে লাগিল। শেষে তাহার কান্নার শব্দে বন পূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

সেই সময় বনের মধ্যে এক রাজা শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অমন সুন্দর একটি মেয়েকে গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতে দেখিয়া, তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সব জানিলেন। তারপর সেকরার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ওহে তুমি এমন সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে ও-রকম খারাপ ব্যবহার করছ কেন ? নেমে এসে ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।' বেচারা সেকরার সত্য কথা বলিতে ভয় করিতে লাগিল। সে বুঝিতেও পারিল যে সত্য কথা বলিলেও তাহা কেহ বিশ্বাস করিবে না। সে বলিল, 'মহারাজ আপনি ওকে নিয়ে যেতে পারেন, আমি ওর সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছি। ও আমার কেউ নয়।' রাজা অত সহজে অমন জিনিষ পাইয়া খুব খুসী হইয়া বলিলেন, 'আমি প্রজাদের কাছে জিনিষ কিনি, উপহার নিই না। তোমার স্ত্রীর দাম এই দু-লাখ টাকা, নেমে এসে টাকা নাও।' সেকরা বলিল, 'টাকা গাছের তলায় রেখে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যতক্ষণ ওকে চোখে দেখা যাবে ততক্ষণ আমি গাছ থেকে নামব না।' রাজা তাহাই করিলেন ; তারপর মেয়েটিকে একটি খুব সুন্দর গাড়ীতে চড়াইয়া নিজের দেশে লইয়া আসিলেন, আর শীঘ্রই খুব ধূমধাম করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন।

রাজার একটি প্রিয় ঘোড়া, একটি প্রিয় কুকুর আর একজন প্রিয় পুত্র ছিল। রাক্ষসী আসিয়াই প্রথমে ঘোড়াটিকে খাইল, খাইয়া তাহার হাড়গোড় অন্য রাণীদের মহলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তার পরদিন রাজা সকালে উঠিয়াই দেখিলেন তাঁহার ঘোড়া নাই। তিনি তখনই গিয়া রাক্ষসী রাণীকে ঐ খবর দিলেন। সে বলিল, 'অন্য রাণীদের মহলে ঘোড়ার খোঁজ কর।' রাজার আরও সাত রাণী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের মহলে খোঁজ করিতে গিয়া ঘোড়ার হাড় পাইলেন। ভাবিলেন, রাণীদেরই বুঝি এই কীর্ত্তি ; তাঁহার বড় রাগ হইল। বেচারী রাণীরা যতই বলেন যে, তাঁহারা কিছুই করেন নাই, রাজা কোন কথাই বিশ্বাস করেন না। তিনি তাঁহাদের খুব বকিতে আরম্ভ করিলেন। যা হোক, শেষে তাঁহাদের প্রাণে না মারিয়া অশেষ দুরবস্থায় ফেলিয়া রাখিলেন।

তার পরদিন কুকুরটিকে পাওয়া গেল না। এক দিন পরে ছেলেটিকেও পাওয়া গেল না। এ-সব দোষও রাণীদেরই ঘাড়ে পড়িল। রাজা এবার এত রাগিলেন যে, সাতজন রাণীরই মাথা কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে অনেক বুঝাইবার পরে তিনি তাঁহাদের মাথা কাটার হুকুম

রদ করিয়া তাঁহাদিগকে কিছু খাবার না দিয়া একটা অন্ধকার কুয়াতে ফেলিয়া দিতে বলিলেন।

বেচারী রাণীরা অনাহারে কাঁদিয়া-কাটিয়া সেই অন্ধকার কূপে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সেই সময় বড়রাণীর একটি ছেলে না হইলে বোধ হয় তাঁহারা ক্ষুধার চোটে একজন আর একজনকে খাইয়া ফেলিতেন। তাঁহারা ছেলেটিকে সাত টুকরা করিয়া কাটিয়া সাতজনে খাইলেন। তারপর মেজরাণীর একটি ছেলে হইল। সেটিরও তার বড় ভাইয়ের দশা হইল। ক্রমে ক্রমে ছয় রাণীরই ছেলে হইল, রাণীরা সকলকেই খাইয়া ফেলিলেন। ছোটরাণীর যখন ছেলে হইল, তখন অন্য রাণীরা বলিলেন, 'বোন, একে মেরে এখন আমাদের খেতে দাও।' তিনি বলিলেন, 'না, আমি আমার ছেলেকে মারব না। এই ছ'টুকরা মাংস নাও, তোমরা আমাকে এগুলো দিয়েছিলে কিন্তু আমি এ-সব খেতে পারিনি। এইগুলো তোমরা খাও, আমার ছেলেটি থাক।' এই বলিয়া তিনি ছ'টুকরা বাহির করিয়া দিলেন। শিব এই ব্যাপার দেখিয়া ছোটরাণীর উপর খুব খুসী হইলেন ; তিনি রাণীর পিতার রূপ ধরিয়া কূপে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, 'মা, আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে দেখা করবার কোন সুবিধা করে উঠতে পারিনি। এখন থেকে রোজ তোমরা আট থালা করে খাবার পাবে, সাত থালা তোমাদের সাতজনের জন্য, আর এক থালা ছেলেটির জন্য।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রাণীরা এখন রোজ অদৃশ্য দাতার নিকট হইতে খাবার পাইতে লাগিলেন। কাজেই আগেকার তুলনায় তাঁহাদের দিন একটু সুখে কাটিতে লাগিল।

দেবতার দেওয়া খাবারের এমন গুণ যে, এক বৎসরের মধ্যেই ছেলেটি কুড়ি বৎসরের ছেলের মত বড় আর জোরাল হইয়া উঠিল। একদিন সে নিজের মাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, আমার কি বাবা, খুড়ো, কিম্বা ঠাকুরদাদা, কি আর কেউ আছেন ? তাঁরা কোথায় ?' রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাছা, তোমার বাবা নেই। আমার বাবা তোমার দাদামশায় হন। তিনিই তোমার একমাত্র আত্মীয়। তিনি ছুতরের কাজ করেন, তিনিই আমাদের রোজ খাবার দিয়ে যান।' রাজকুমার বলিলেন, 'মা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আর এখান থেকে যেতে দাও, আমি তাঁকে খুঁজে পাই কিনা দেখি, আর এই অন্ধকার জায়গাটা থেকে চলে যেতে পারি কিনা তাও দেখি। তাঁহার মা তাঁহাকে অনেক বারণ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। শেষে রাণী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ছেলেকে বিদায় দিলেন ; রাজকুমার নিজের মাতামহকে খুঁজিতে চলিলেন।

তাঁহার মা তাঁহাকে যে পথ বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই পথে চলিতে চলিতে তিনি মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলেন, আর দাদামহাশয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, 'দাদামশায়, আমি তোমাকে দেখতে আর তোমার দেশের সব আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে এসেছি।' বুড়ো নাতিকে দেখিয়া খুব খুসী হইল এবং বলিল, 'কি পেলে তুমি খুব খুসী হও বল তো দাদা।' কুমার বলিলেন, 'আমাকে এখন একটা কাঠের ঘোড়া করে দাও, যে আমার কথামত আকাশেও উড়বে, মাটিতেও ছুটবে।' ছুতার নাতিকে কয়েক দিন তাহার বাড়ী থাকিতে বলিয়া ঘোড়া তৈরি করিতে আরম্ভ করিল। এক সপ্তাহেই সে ঘোড়া বানাইয়া নাতিকে দিল।

রাজকুমার অমন কাজের জিনিষ পাইয়া আহ্লাদে আটখানা। তিনি ঘোড়া চড়িয়া সোজা রাজবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজার দরবারে গিয়া তিনি চাকরি চাহিলেন। রাজা যদিও তাঁহাকে নিজের ছেলে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তাহা হইলেও কুমারের চেহারা দেখিয়া খুসী হইলেন আর তাহাকে পাহারাওয়ালাদের সর্দ্দার করিয়া রাক্ষসী রাণীর মহল পাহারা দিতে পাঠাইলেন। রাজকুমার কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া মহলের চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার বীরের মত চেহারা দেখিয়া যত চোর-ডাকাত সেখান হইতে পলাইল। তিনি আসাতে রাক্ষসীর চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া রাণী স্বয়ং জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া নূতন পাহারাওয়ালাকে দেখিতে আসিল। তাঁহার সঙ্গে রাজার সাদৃশ্য দেখিয়াই রাক্ষসী বুঝিতে পারিল যে, এই সেই কূয়োয়-ফেলা রাণীদের ছেলে।

রাত্রি হইলে রাণী নিজের সব দামী কাপড়, গহনা খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া চুল উস্কোখুস্কো করিয়া ছেঁড়া কাপড় পরিয়া গোসাঘরে গিয়া খিল দিল। রাজা রাণীর মহলে আসিয়া কোথাও আর রাণীকে খুঁজিয়া পান না; শেষে দাসীদের ডাকিয়া রাণীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিল, 'রাণীমা, আজ সারাদিন কেঁদেছেন আর বুক চাপড়িয়েছেন। এখন তিনি গোসাঘরে গিয়ে খিল দিয়েছেন।' রাজা ভাবিলেন, নিশ্চয় একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে, তা না হইলে রাণীর এত রাগ হইবে কেন? তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া দেখিলেন, রাণী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে। রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'তুমি কি মনে কর যে আমার মায়া-মমতা কিছুই নেই? এখনি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও; আমি অনেকদিন সেখানকার কোন খবর পাইনি। এখ্‌খনি সেখানকার খবর আনতে কাউকে পাঠাও; আর সঙ্গীতকারী জল আর বনস্পতি চাল আনতেও লোক পাঠাও। ঐ বনস্পতি চল্লিশ গজ উঁচু, আর ওতে রাঁধা ভাত ফলে। এই জিনিষগুলো আমাকে শীগগির আনিয়ে দাও, তা না হলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। তোমার নূতন পাহারাওয়ালাকে এই কাজে পাঠাও।' রাজা তাহার কথামত কাজ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তার পর তিনি রাজকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওহে বীরপুরুষ, "বনস্পতি চাল" আর "সঙ্গীতকারী জল" তোমাকে নিয়ে আসতে হবে। রাণীর আত্মীয়দের খবরও এনো। যত অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া আসা করতে পার, ততই ভাল। রাণী তাঁর বাবাকে এই চিঠিখানা লিখেছেন, এটাও নিয়ে যাও।'

রাজকুমার তখনই রাক্ষসের দেশের পথে যাত্রা করিলেন। অনেক মাস কাটিয়া গেলে তিনি একটি গহন বনের কাছে আসিলেন। সেখানে তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলেন; অনেকক্ষণ হাঁটিবার পর এক ভীষণ সিংহের সামনে পড়িলেন। রাজকুমার ভয় পাইলেও বুদ্ধি হারাইলেন না। মুখে খুব সাহস দেখাইয়া সিংহের কাছে গিয়া বলিলেন, 'কি মামা, কেমন আছ।' সিংহ তো অবাক! সে খুব উৎসাহ করিয়া রাজকুমারকে খাইতে আসিয়াছিল, এখন তিনি তাহার আপন ভাগ্নে শুনিয়া সে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। কি আর করে! তখন নরম সুরে বলিল, 'এস এস, ভাগ্নে যে! চল তোমার

দিদিমার সঙ্গে দেখা করবে চল।' রাজকুমার সিংহের সঙ্গে গিয়া তাহার গর্ত্তে ঢুকিয়া বলিলেন, 'প্রণাম হই, দিদিমা; কেমন আছ?' দিদিমাও তাঁহাকে অনেক আদর-যত্ন করিল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দূরে গিয়াই তিনি আবার এক নেকড়ে বাঘের মুখে পড়িলেন। তার সঙ্গেও খুড়া-ভাইপো সম্পর্ক পাতাইয়া তিনি উদ্ধার লাভ করিলেন। এই রকমে যত বুনো জন্তুরই সামনে পড়িলেন, সকলকেই হয় মামা, না হয় কাকা, জ্যাঠা, ঠাকুরমা কিছু একটা বলিয়া নির্বিঘ্নে বন পার হইলেন। বন হইতে বাহির হইয়াই তিনি একটি ছোট খড়ের ঘর দেখিতে পাইলেন। উহার মধ্যে এক যোগী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া ছিলেন। রাজকুমার তাঁহার ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি চোখ মেলিলে পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'প্রভু আমার দুঃসাহসের কাজে আপনি একটু সাহায্য করুন। রাণীর আত্মীয়দের বনস্পতি চাল আর সঙ্গীতকারী জল কোথায় পাওয়া যাবে তা আমাকে বলে দিন। যাঁর ঠিকানা এই চিঠিতে লেখা রয়েছে, তিনি কোথায় থাকেন?' যোগী রাজকুমারকে তিন দিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, তাহার পর তিনি পথ বলিয়া দিবেন। রাত্রি হইলে কুমার কুটীরের মধ্যে একটা মাদুরে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। যোগী যখন দেখিলেন যে তাঁহার অতিথি খুব ঘুমাইতেছে, তখন তিনি চিঠিখানি লইয়া ধুনীর আগুনে পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ—

…"প্রিয় ভ্রাতঃ,

তুমি এই লোকটিকে দেখিবামাত্র খাইয়া ফেলিও। ইতি।

তোমার স্নেহের বোন
ছাগলী রাক্ষসী।"

যোগী চিঠিখানি পুড়াইয়া ফেলিয়া, আর একখানা কাগজ লইয়া লিখিলেন ঃ—

"প্রিয় ভ্রাতঃ,

এই পত্রবাহক আমার পুত্র, তোমার ভাগিনেয়। ইহাকে যত্ন করিও এবং ইহার হাতে বনস্পতি চাল আর সঙ্গীতকারী জল পাঠাইয়া দিও। ইতি।

তোমার স্নেহের বোন
ছাগলী রাক্ষসী।"

যোগী এই চিঠিখানি রাজকুমারের থলির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। সকাল হইলে তিনি কুমারকে রাক্ষসের দেশে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'যদি তোমার কাজে সফল হও, তা'হলে আসবার সময় রাক্ষসদের বাড়ীতে যত হাড় আছে, সব নিয়ে এস। একখানাও ফেলে এস না।'

রাজকুমার যোগীকে ধন্যবাদ দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে রাক্ষসদের দুর্গে পৌঁছিলেন। যে বাড়ীতে সেই সাত সেকরা কাজ করিতে আসিয়াছিল, এ সেই বাড়ী। সেখানে যাইবামাত্র লোকজনেরা তাঁহাকে সর্দ্দারের কাছে লইয়া গেল। তিনি তাহাকে

চিঠি দিলেন। চিঠি পড়িয়া রাক্ষস মহা খুসী হইয়া তাঁহাকে ভাগিনেয় ভাবিয়া খুব আদর করিতে লাগিল। তার পর সমস্ত রাক্ষসদের ডাকিয়া রাজকুমারের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করিয়া দিল এবং সকলকে তাঁহার উপর কোনও অত্যাচার করিতে বারণ করিয়া দিল। একটু পরে সর্দ্দার রাজপুত্রকে নিজের মার কাছে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে ঐ বুড়ীর হাতে দিয়া আসিল। তিনি রাক্ষসদের দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন।

বাহিরে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন খুব আমোদেই আছেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সব সময়েই নিজের কাজ উদ্ধার করিবার চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। বুড়ীর সঙ্গে তিনি শীঘ্রই খুব ভাব করিয়া লইলেন। সে তাঁহাকে নাতি ভাবিয়া সব কথাই বলিতে আরম্ভ করিল। একদিন রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নানী (দিদিমা), এ বাড়ীতে যে-সব অদ্ভুত জিনিষ আছে, সে-সব আমাকে দেখাও না কেন? তোমার, আমার মামার, আর অন্য সব রাক্ষসদের প্রাণ কিসে আছে আমি জানতে চাই। আমি তোমাদের এত ভালবাসি যে, পাছে তোমাদের কোনও অনিষ্ট হয়, সেই ভয়ে আমার ঘুম হয় না।' বুড়ী বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার কোনও ভাবনা নেই। আমরা কি মরার ভয় করি? আমাদের প্রাণ অত সহজে যায় না। আমার সঙ্গে এস, তা'হলেই আমার কথার মানে বুঝতে পারবে।'

এই বলিয়া সে তাঁহাকে লইয়াই একটা ঘরে ঢুকিল। ঘরটা টিয়া, ময়ুর, পায়রা, চড়াই প্রভৃতি পাখীতে ভরা। রাজকুমার অত রঙ-বেরঙএর পাখী দেখিয়া ভাবিলেন, তিনি চিড়িয়াখানায় আসিয়াছেন। বুড়ী রাক্ষসী বলিল, 'এই পাখীগুলো আমাদের প্রাণ। এরা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন আমরা কিছুতেই মরব না। এরা মরলেই আমাদেরও মরণ হবে। দেখ, এদের কত সাবধানে রাখা হয়েছে; কাজেই কেউ এদের কোন অনিষ্ট করতে পারে না। সেইজন্য আমাদেরও মরবার ভয় নেই। এই দাঁড়কাকটা আমার প্রাণ, ঐ টিয়েটা তোমার মামার, আর ঐ ময়ুরীটা তোমার মায়ের প্রাণ।' রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নানী, সঙ্গীতকারী জল আর বনস্পতি চাল কোথায় আছে?' বুড়ী তাঁহাকে আর-একটা ঘরে লইয়া গেল। সেখানে এক বোতল নির্ম্মল জল ছিল। তার মধ্য হইতে খুব সুন্দর গান শোনা যাইতেছিল। বুড়ী বলিল, 'এই সঙ্গীতকারী জল। তারপর তাঁহাকে বাগানে লইয়া গিয়া একটা প্রকাণ্ড গাছ দেখাইয়া বলিল, 'এই বনস্পতি চালের গাছ।'

রাক্ষসদের বাড়ীর সব গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়া রাজকুমারের খুব স্ফূর্ত্তি হইল। তারপর তিনি আরও অনেক ঘর দেখিলেন, কোনটা সোনায়, কোনটা হীরায়, কোনটা বা মণিমুক্তায় ভরা। রাক্ষসেরা মানুষ খাইয়া যে ঘরে তাহাদের হাড় জমা করিয়া রাখিয়াছিল, সে ঘরটাও তিনি দেখিলেন। একদিন সব রাক্ষস-রাক্ষসীরা অন্য এক রাক্ষসের বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইতে গেল। রাজপুত্র সুবিধা বুঝিয়া সেই পাখীর ঘরে ঢুকিয়া, এক-একটাকে ধরিয়া ঘাড় মটকাইতে লাগিলেন; ময়ূরীটাকে কেবল মারিলেন না। রাক্ষসদের মৃতদেহে দুর্গের সিংহদ্বারে একটা পাহাড় হইয়া গেল। রাজকুমার তখন সঙ্গীতকারী জল, বনস্পতি চালের গাছের একটা ডাল, আর সমস্ত মানুষের হাড়গুলো একটা পুঁটলী বাঁধিয়া লইয়া বাহির হইলেন; ময়ূরীটাকেও লইতে ভুলিলেন না। খানিকক্ষণ হাঁটিয়াই তিনি যোগীর কুটীরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তিনি রাক্ষসদের দুর্গ হইতে যাহা যাহা আনিয়াছিলেন, সব যোগীকে দেখাইলেন। যোগী সব হাড়গুলি এক জায়গায় করিয়া, তাহার উপর সঞ্জীবকারী জল ঢালিয়া দিলেন। তখনই তাহারা আবার জীবন্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে সেই ছ'জন সেকরাও ছিল। তাহারা যোগীকে দেখিয়াই তাহাদের সপ্তম বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহাদের অবশ্য খুবই আনন্দ হইল। যোগী তখন তাহাদিগকে নিজের সব কথা বলিলেন। তিনি রাক্ষসের দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়া এইখানে রাক্ষসদের ধ্বংস ও নিজের বন্ধুদের বাঁচাইবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন।

রাক্ষসী রাণীর সব কথাও তিনি রাজপুত্রকে বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, 'কুমার, তুমি যে রাজার বাড়ী কাজ কর, তিনি তোমার বাবা। যে রাণী তোমাকে এই কাজে পাঠিয়েছে, সে-ই তোমার মা আর বিমাতাদের সব দুর্দশার মূল। কিন্তু তার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। চল, আমরা সকলে মিলে রাজার কাছে গিয়ে তার আসল পরিচয়টা দিয়ে দিই।' রাজকুমার অন্য সকল লোককে বিদায় দিয়া শুধু সাত সেকরাকে আর নিজের পুঁটলীটি লইয়া বনে ঢুকিলেন। পথে আবার তাঁহার সিংহ মামা, নেকড়ে কাকা, বাঘ জেঠা, সাপ পিসে প্রভৃতি সকলের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া খুব খুসী হইল। প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিজের এক-একটি ছানা উপহার দিল। রাজকুমার নিজের অদ্ভুত অনুচরদের সঙ্গে লইয়া বন হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়াই আপনার কাঠের ঘোড়াটি দেখিতে পাইলেন। তাহার উপর চড়িয়া তিনি নগরের দিকে চলিলেন। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে প্রভৃতি সঙ্গীরা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে যাদুকর ভাবিল।

নগরের বাহিরে আসিয়া রাজকুমার ভেল্কিওয়ালার পোষাক পরিলেন; তার পর সাত সেকরাকে লইয়া রাজার দরবারে ঢুকিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা রাক্ষসের খেলা নামক এক রকম খেলা দেখাইবেন। রাজা খেলা দেখিবার জন্য অনেক লোককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজকুমার খেলা আরম্ভ করিলেন। দর্শকরা তাঁহাকে নির্ভয়ে ঐ বন্য জন্তুর দলে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া খুব বাহবা দিতে লাগিল। তিনি একটা বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিবামাত্র জন্তুগুলি তাঁহার চারিধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। তখন তিনি বনস্পতি গাছের ডালটি মাটিতে পুঁতিয়া দিলেন। অমনই সেটা একটা মস্ত গাছ হইয়া গেল, আর তাহা হইতে পোলাও বৃষ্টি হইতে লাগিল। সকলে তাহা মুঠা মুঠা করিয়া খাইতে লাগিল ও খাইয়া বলিল যে তাহারা এমন জিনিষ জন্মে কখনও খায় নাই। তার পর একটা গর্ত খুঁড়িয়া, বোতল হইতে বাকি সঞ্জীবকারী জলটা তাহাতে ঢালিয়া দিলেন। তখনই সুন্দর গানের সুরে সমস্ত রাজপ্রাসাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই-সব খেলাই সাতদিন চলিল। সাতদিন ধরিয়া চীৎকার করিয়া বাহবা দিতে দিতে সব লোকের গলা ভাঙিয়া গেল, কিন্তু উৎসাহে তাহারা তবু চেঁচাইতে লাগিল।

শেষ দিনে রাজকুমার বলিলেন, 'এখন আমরা, আমাদের সব থেকে অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে, বাজী শেষ করব; এই খেলার নাম ময়ূরীর নাচ।' ময়ূরীকে বাহির করিয়া তিনি তাহাকে নাচিতে আজ্ঞা করিলেন। ময়ূরী নাচিতে আরম্ভ করিবামাত্র রাক্ষসী রাণীও অন্দরমহল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

সকলের সামনে নাচিতে লাগিল। রাজা ব্যাপার দেখিয়া হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। রাজপুত্র ময়ূরীর একটা পা ভাঙিয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে রাণীরও একটা পা খসিয়া গেল। ময়ূরী এক পায়ে নাচিতে লাগিল, রাণীও এক পায়েই নাচিতে লাগিল। তিনি ময়ূরীর একটা ডানা ছিঁড়িয়া দিলেন, রাণীরও একখানা হাত পড়িয়া গেল; কিন্তু তখনও তাহাদের নাচ থামিল না। শেষে রাজপুত্র ময়ূরীকে ধরিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিলেন। রাণী বিকট চীৎকার করিয়া, চল্লিশ হাত লম্বা রাক্ষসীর মূর্তি ধরিয়া, পড়িয়া মরিয়া গেল। যত লোক সেখানে ছিল, সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'এ কি কাণ্ড! এটা কে?'

রাজকুমার তখন সামনে আসিয়া বলিলেন, 'আপনারা যাকে দেখছেন, এ একজন রাক্ষসী। ঐ পাপিষ্ঠাই এই রাজ্যের সব দুর্গতির মূল।' এই বলিয়া তিনি একটু ক্ষণের জন্য বাহির হইয়া গেলেন। তারপর যাহা ঘটিল, তাহা আরও আশ্চর্য। সাতজন সেকরা সাত রাণীকে লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাদের পিছনে সাত রাজপুত্র আসিলেন। সেকরা সাতজন রাজার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'এই সাতজন তোমার রাণী, এদের প্রতি তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলে। আর এই সাত রাজকুমার তোমার ছেলে। তুমি এদের নাও।' তারপর যোগী সেকরা, কিরূপে রাণিরা ও তাঁহারা সঞ্জীবকারী জলের মৃতসঞ্জীবনী শক্তিতে বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, আর ছোট রাজকুমার কি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়াছেন, সে-সব কথাই বলিলেন। রাজার আর সমস্ত প্রজার আনন্দ তখন দেখে কে! আনন্দ হইবারই কথা, কেন না সেই প্রিয় পুত্র, প্রিয় ঘোড়া, এমন কি প্রিয় কুকুরটাও জলের গুণে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল।

রাজা বিক্রম ও ফকিরের কথা

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী লোক ছিলেন। প্রজাদের মধ্যে তাঁর সুবিচারক বলিয়া খুব নাম ছিল। তিনি কত সময় একলা ছদ্মবেশে প্রজাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেন। এই রকম করিয়া তিনি যে কত আশ্চর্য ও অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করিতেন এবং কত রহস্য ভেদ করিতেন, তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাঁহার রাজ্যে কখনও কুশাসনের কথা শোনা যাইত না।

একবার এক যোগী তাঁহার রাজ্যে আসিয়া রাজধানীর বাহিরে নদীর পারে আশ্রয় লইলেন। সেখানে একটি ছোট কুটির বাঁধিয়া তাহার মাঝখানে ধুনী জ্বালাইয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর সমস্ত দিন বসিয়া থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ও আশ্চর্য তপস্যার কথা শহরে ছড়াইয়া পড়িল, আর দলে দলে লোকে তাঁহাকে দেখিতে ও পূজা করিতে আসিতে লাগিল। তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদল দিন দিনই বাড়িতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিনই অনেক নূতন নূতন লোক তাঁহার ভক্তবৃন্দ হইতে লাগিল। শেষে রাজপ্রাসাদে পর্যন্ত এই যোগীর প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতে দেখা গেল। নানা কারণে এই যোগীর উপর বিক্রমের সন্দেহ

উপস্থিত হইতে লাগিল। ইনি যে নিতান্ত ভালমানুষ নহেন, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং সন্ন্যাসীবেশ ধরিয়া তিনি যে রাজার প্রাণবধের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন তাহা বুঝিতেও তাঁহার বাকি রহিল না। আসল ব্যাপার জানিবার জন্য রাজা বিক্রম একদিন রাত্রে অতি গোপনে ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া তিনি সেই যোগীর কুটীরের এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন।

কুটীরের মধ্যে যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। দেখিলেন, চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া মাঝখানে যোগী বসিয়া আছে ও তাহার সম্মুখে একটা মড়া পড়িয়া রহিয়াছে। মড়াটা মাটির উপর চিৎ হইয়া আছে, আর তাহার বুকের উপর রাজার আগেকার মন্ত্রী বসিয়া রহিয়াছে। এই রাজমন্ত্রী রাজার বিরোধী ছিল বলিয়া রাজা তাহাকে বরখাস্ত করেন। সে বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র বলিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তচন্দন-মাখা ফুল বেলপাতা প্রভৃতি মড়ার মুখের মধ্যে ফেলিতেছে। মন্ত্রবলে মরা লোকটাকে বাঁচাইবার চেষ্টা হইতেছিল। ইহার প্রায় একঘণ্টা পরে মন্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'কথা বল, বাছা, কথা বল।' ভীত বিক্রম দেখিলেন, মড়ার মুখ নড়িতেছে, কিন্তু কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না। মন্ত্রী আবার বলিতে লাগিল, 'বাছা, কথা বল। তুমি আমার প্রাণের ধন; আমি কেবল অকৃতজ্ঞ রাজাটার কাজের প্রতিশোধ নেবার জন্যই তোমাকে মা কালীর কাছে বলি দিয়েছি। বল বাছা, কথা বল।' এইরূপে দেবতার নাম করিয়া অনুরোধ করিবার পর পুত্রহন্তা মন্ত্রী তাহার পুত্রের মুখে আবার ফুল চন্দন বেলপাতা প্রভৃতি দিল। আবার তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু শব্দ হইল না। নিষ্ঠুর পিতা আবার চীৎকার আরম্ভ করিল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। এইরূপে বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া যোগী বলিল, 'বৎস, ধৈর্য্য ধর, এই ঘরে নিশ্চয়ই কোন অচেনা লোক ঢুকেছে। সে দীক্ষা গ্রহণ না করেই আমাদের গোপন রহস্যের মধ্যে এসেছে। সেই জন্যই দেবী উত্তর দিচ্ছেন না।' এই বলিয়া যোগী উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, 'যে আমাদের এই পবিত্র গোপন কার্য্য দেখিতেছে, সে কুকুর হইয়া যাউক।' সে তিনবার এই কথা আবৃত্তি করিল। বিক্রম ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নড়িতে পারিলেন না। তৃতীয়বার বলিবামাত্রই তিনি কুকুর হইয়া গেলেন এবং সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ভোর হইল, কিন্তু এখনও রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু পাছে এই সংবাদ শুনিয়া প্রজারা উত্তেজিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে রাজা অসুস্থ বলিয়া কয়েকদিন দরবারে বসিবেন না, এইরূপ প্রচার করা হইল। ইতিমধ্যে রাজার খোঁজের জন্য চারিদিকে গুপ্তচর ছুটিল, কিন্তু সকলই বৃথা। তারপর রাজমন্ত্রী ও রাজ্যের অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরামর্শ করিয়া বৃদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহিরের উপদেশ গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গুণিয়া রাজার সন্ধান বলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। জ্যোতিষী নিজ বিদ্যাবলে রাজা কোথায় আছেন, এবং যোগীর অভিশাপে কি অবস্থায় আছেন, সমস্ত বাহির করিলেন।

তারপর রাজার সভাসদবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এই মায়াবীর হাত হ'তে রাজাকে উদ্ধার করা বড় কঠিন ব্যাপার। এ লোকটা আমাদের রাজার ভীষণ শত্রু। বিক্রমের চার বীর যদি তাঁকে রক্ষা না করত তা'হলে স্বচ্ছন্দেই ও তাঁকে মেরে ফেলত। কিন্তু যদিও এতদিন এরা রাজাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যোগীর মড়া বাঁচানোর ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে আর সে ক্ষমতাও এদের থাকবে না। কিছুদিন পরেই এই ভীষণ ব্যাপার শেষ হবে, তখন কালীর শক্তির কাছে বীরের শক্তির আর কোনও মূল্য থাকবে না। শীঘ্রই মহারাজকে রক্ষা করবার জন্য একটা কিছু করা দরকার হয়ে পড়েছে।' এই বলিয়া তাদের বিদায় দিয়া তিনি রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে বসিলেন।

ক্রমশঃ জ্যোতিষীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি তখন আপনার যমজ পুত্রদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাদের কাছে রাজার শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'বাছা, আমরা বহুকাল রাজার অন্ন খেয়েছি। এখন আমাদের কৃতজ্ঞতা দেখাবার সময়। আমাদের জীবন দিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে হবে। এই বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে প্রস্তুত আছ তো?' সেই সুন্দর ছেলে দুটি একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'বাবা, কবেই বা আমরা তোমার ও মহারাজের আজ্ঞা পালন করি নাই? বল, আমরা কিরূপে এই কাজে সাহায্য করতে পারি?' তাহাদের পিতা খুব খুসী হইয়া তাহাদের লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং পরপারে সন্ন্যাসীর কুটীর দেখাইয়া বলিলেন, 'ঐ দেখ, সেই মায়াবীর ঘর। দরজার কাছে গিয়ে একটি কালো কুকুর দেখবে। সেই কুকুররূপী লোকটিই আমাদের মহারাজ। আমি তোমাদের সুন্দর দুটি হরিণ করে দেব; তোমরা গিয়ে কুকুরটিকে ভুলিয়ে নদীর এপারে নিয়ে আসবে। নদীটা এমন কিছু গভীর নয়; কুকুর তোমাদের দেখলেই পেছন পেছন আসবে। এই নদীর মাঝখান পর্য্যন্ত ঐ যোগীর ক্ষমতার ভিতর, আর এক চুল এদিকে এলেই যোগীর আর কোন শক্তি খাটে না। এখন যত তাড়াতাড়ি পার ছুটে গিয়ে কুকুরটিকে এই সীমানার বাইরে নিয়ে এস। যতক্ষণ তোমরা নদীর মাঝ-খানের ওদিকে থাকবে ততক্ষণ তোমরা যোগীর ক্ষমতার ভিতর থাকবে, ততক্ষণই তোমাদের প্রাণের ভয় আছে; এদিকে এলেই নিরাপদ।' এইরূপে সাবধান করিয়া দিয়া জ্যোতিষী দুই ভাইকে দুটি মনোহর হরিণ করিয়া দিলেন। তাহারা সাঁতার দিয়া যোগীর কুটীরের দিকে চলিল।

হরিণ-দুটি কুটীরের দরজার কাছে আসিল। কুকুরটি তাহাদের দেখিবামাত্র চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের তাড়া করিল। হরিণ দুটি নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কুকুরও তাহাদের পিছনে ছুটিল। কুকুরের চীৎকারে যোগীর ধ্যান ভাঙিয়া গেলে সে দেখিল, কুকুর হরিণের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। প্রথমে সে আসল ব্যাপার কি বুঝিতে পারে নাই, কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিবার পর বুঝিতে পারিল ইহারা হরিণ নয়, মানুষ। যোগী তৎক্ষণাৎ চিল হইয়া হরিণদের চোখ তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে উড়িয়া চলিল। রাজার রক্ষক চারি বীর তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এক ধূলার ঝড় তুলিল, কাজেই চিল আর তাহার শিকার দেখিতে পাইল না। এদিকে পলাতক রাজা ও যমজ বালক-দুটি প্রায় নদীর মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে; ঠিক সেই সময় চিলটা অতি বেগে ধূলিরাশি ভেদ করিয়া আসিয়া সম্মুখের

হরিণের একটা চোখ তুলিয়া লইল। পরমুহূর্তেই তাহারা নদীর মধ্যরেখা ছাড়াইয়া গেল। এখন আর যোগীর আক্রমণের ভয় নাই। চিলটা আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতে লাগিল, কিন্তু সীমা-রেখা পার হইতে সাহস করিল না।

নদীর তীরে পৌঁছিলে জ্যোতিষী তাহাদের আবার মানুষ করিয়া দিলেন। রাজা বিক্রম এমন সাহায্য পাইয়া কৃতজ্ঞতায় গলিয়া পড়িলেন। ছোট ছেলেটির একটি চোখ যাওয়াতে তাঁহাদের সুখের মধ্যে দুঃখের ছায়া আসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু তবুও বৃদ্ধ জ্যোতিষীর সাহায্যে রাজা বিপজ্জনক পীড়া হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন শুনিয়া সমস্ত নগর আনন্দোল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজা ও যোগীর ব্যাপার গোপনেই রহিয়া গেল। কিন্তু রাজা দেখিলেন, যোগীর দল দিন দিন শক্তি ও সংখ্যাতে বাড়িতেছে। রাজার রক্ষক বীরগণও বলিল যে, তাহারা আর বেশী দিন তাঁহাকে যোগীর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা বিষম বিপদে পড়িলেন। কি আর করেন, জ্যোতিষী এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিবেন কি না জানিতে গেলেন। বরাহমিহির কিছুক্ষণ গণনা করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, মায়াবীর সঙ্গে লড়াই করবার পক্ষে আমার শক্তি যথেষ্ট নয়। আমি মাত্র তিনটি বিদ্যা জানি, আর যোগী তেরটি বিদ্যা জানে। আমি ধ্যানে সমস্ত পৃথিবী খুঁজে দেখলাম, চীনদেশের রাজকন্যা ছাড়া আর কেউ এই যোগীর থেকে বেশী বিদ্যা জানে না। রাজকন্যা চৌদ্দটি বিদ্যা জানেন। তিনিই কেবল আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন। আপনি যদি তাঁকে বিবাহ করতে পারেন, তবেই আপনার জীবন রক্ষা হয়।' এই কথা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীদের ডাকিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজ্যভার দিয়া একলা ঘোড়ায় চড়িয়া চীনদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। মন্ত্রীরা তাঁহাকে এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করিতে অনেক বার বারণ করিল। কিন্তু তিনি তাহাদের কথা না শুনিয়া তাঁহার হাওয়ার মতন দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া শহরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত যাইবার পর তিনি এক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হ্যাঁ ভাই, এ কার রাজ্য ?' পথিক তো তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া অবাক। সে বলিল, 'সে কি, তুমি জান না ? এ সমস্ত দেশ সাধু মহাবীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের।' রাজা চলিতে লাগিলেন, যাইতে যাইতে যত জায়গায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বত্রই শুনিলেন, 'মহারাজ বিক্রমের রাজ্য।' কখনও মনে করেন নাই যে তাঁহার রাজ্য এত বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ; এখন নিজে চোখে দেখিয়া এই বিস্তৃত রাজ্য নিজ বংশের অধিকারে রাখিবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়া উঠিল। কাজেই তিনি সকল অসুবিধা সহ্য করিয়াও যোগীর অভিসন্ধি বিফল করিতে সঙ্কল্প করিলেন। যাত্রার কয়েক মাস পরে তিনি আপনার রাজ্যসীমা ছাড়াইয়া চীনরাজ্যে আসিয়া পড়িলেন এবং আরও কয়েক সপ্তাহ পরে চীন রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল ; কাজেই এমন সময় শহরে প্রবেশ করা উচিত নয় মনে করিয়া রাজা নগরের বাহিরে এক বাগানে বিশ্রাম করিতে নামিলেন। একটা গাছের গুঁড়িতে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি মাটিতে শুইয়া পড়িলেন এবং ক্লান্ত শরীরে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলেন।



"সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলোগুলি উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল।"



রাজকন্যা সেই তুলোর গলায়, মালা পরাইয়া দিলেন।



চিলটা অতিবেগে ধূলিরাশি ভেদ করিয়া আসিয়া সম্মুখের হরিণের একটা চোখ তুলিয়া লইল।

ঘটনাক্রমে একদল চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল ; রাস্তায় ঘোড়া দেখিয়া বুঝিল আজ কপাল ভাল। দলপতি প্রতিজ্ঞা করিল, 'আজ চুরি করে যা পাব এই সুলক্ষণ ঘোড়াকে তার এক ভাগ দেব।' তারপর তাহারা শহরে ঢুকিয়া রাজার ধনাগার ভাঙিয়া হীরা মণিমুক্তা সব লুট করিয়া আনিল। পথে তাহাদের কেহই দেখিতে পায় নাই। গাছতলায় রাজা বিক্রমাদিত্য তখনও ঘুমাইতেছিলেন। তাহারা সেইখানে আসিয়া ভাগ করিতে বসিল। "নওলাখা হার" নামে একটা খুব দামী হার ঘোড়ার ভাগ্যে পড়িল। চোরেরা ঘোড়ার গলায় হারটা পরাইয়া দিয়া নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই চুরির কথা জানা গেল। তখন চোর ধরিবার জন্য চারিদিকে পাহারাওয়ালা ছুটিল। রাজা বিক্রম যেখানে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কয়েকজন সেখানে আসিয়া ঘোড়ার গলায় হার দেখিয়া ঘুমন্ত লোকটিকেই চোর বলিয়া ঠিক করিল। কাজেই তাহারা তাঁহাকে ঠেলা মারিয়া তুলিয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঘোড়া-সুদ্ধ চীন সম্রাটের নিকট লইয়া উপস্থিত করিল। রাজা ইচ্ছা করিলেই স্বচ্ছন্দে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া নিজে মুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন তাঁর নিজ পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিয়াই চুরির শাস্তি লইতে অগ্রসর হইলেন। বিক্রমের বিরুদ্ধে এরূপ প্রমাণ দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে চোর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং জল্লাদকে ডাকিয়া তাঁহার হাত-পা কাটিয়া শহরের মাঝখানে ফেলিয়া রাখিতে বলিলেন।

চীনদেশের বর্ব্বর জল্লাদ নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়া বিক্রমকে শহরের মাঝখানে ফেলিয়া গেল। লোকেরা তাঁহাকে নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করিয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ক্রমাগত রক্তস্রাব হওয়াতে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল ও প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কেহ একবার দয়া করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না। রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় এক কলু সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। এমন সুন্দর যুবকের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া লোকটির মনে দয়া হইল। সে তাঁহার কাছে আসিয়া কাটা হাত পা বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে অতি সন্তর্পণে নিজ কুটীরে লইয়া গেল। কলুর স্ত্রী ভারি ঝগড়াটী ছিল। সে স্বামীকে এরূপ একটা বোঝা আনিতে দেখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'ওরে বোকা লক্ষীছাড়া, এ কি করেছিস ? এ নুলোটাকে কি জন্যে এনেছিস ? তুই কি জানিস না যে ও-লোকটা চুরি করে তার ফল ভোগ কচ্ছে ? সম্রাট যদি জানতে পারেন যে আমরা ওটাকে ঘরে ঠাঁই দিয়েছি, তা'হলে আমাদের জাঁতার তলায় ফেলে গুঁড়ো করে দেবেন। যা শীগগির, ও যেখানে ছিল সেইখানে রেখে আয়।' কিন্তু দয়ালু কলু এরূপ হৃদয়হীনার পরামর্শ শুনিল না। সে খুব জোর করিয়া বলিল, 'ওগো শোন, আমি এ লোকটিকে জেনে-শুনে ঘরে এনেছি। ধরা পড়লে আমাদের যে কি দশা হবে তা আমি বেশ ভাল করেই জানি। আমি একে ছেলে বলেছি, তুমিও এর সঙ্গে মায়ের মত ব্যবহার করবে। আমি যা মানুষের কর্ত্তব্য বলে জানি তা করবই, কোন রকম স্বার্থপর কথা শুনব না। যাও, এর ঘায়ে দেবার জন্যে ওষুধ তৈরী করে নিয়ে এস।' কলুনী তার কথামত ঘা পরিষ্কার করিয়া দিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার খুব যত্ন করিতে আরম্ভ করিল। কলুর সদয় ব্যবহার এবং কলুনীর অনিচ্ছাকৃত সেবায় রাজা বিক্রমের ঘাগুলি কিছুদিনের মধ্যেই শুকাইয়া উঠিল

এবং তিনি নিজ শক্তি ফিরিয়া পাইতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিবার পর কলু তাঁহাকে ঘানির উপর বসাইয়া দিত এবং বলদের ঘানির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ঘানিগাছের চারিদিকে ঘুরাইত। রাজা সমস্ত দিনই ঘানির সঙ্গে ঘুরিতেন। কলু তাঁহাকে খাওয়া পরা সব বিষয়েই সাহায্য করিত। এমনি করিয়া ঘানিতে বসিয়া তাঁহার দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন কলু বিক্রমকে অপরিষ্কার দেখিয়া তাঁহার স্নানের আবশ্যক বুঝিয়া স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো, আমার ছেলেটিকে আজ স্নান করিয়ে দিও, তাকে বড় অপরিষ্কার দেখাচ্ছে।' কিন্তু রাজা বিক্রম বাধা দিয়া বলিলেন, 'না বাবা, তুমি যদি আমাকে রাজকন্যার গ্রীষ্মকালের বাগানের পুকুরে স্নান না করিয়ে আন, তা'হলে আমি স্নান করব না।' এই কথা শুনিয়া কলুনী রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, 'দেখ একবার নুলোটার আস্পর্দ্ধা! রাজকন্যার পুকুরে নইলে স্নান করা হবে না! ও পুকুর তোমার থেকে অনেক উঁচুদরের লোকের জন্যে, তা কি জান না নাকি? এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষ মানুষের পা রাজকন্যার বাগানে পড়েনি। ওগো, তুমি ও নুলোটার খেয়াল শুনে অমন বোকামির কাজ করতে যেও না।' তাহার স্বামী বলিল, 'আমি করবই। মনে রেখো ও আমার ছেলে; ওর একটা সামান্য সাধ মেটাবার জন্যে আমি সবই করব। তা এতে যা-ই হোক না কেন?' এই বলিয়া সে অন্ধকার হইবার পর রাজাকে কাঁধে করিয়া রাজকন্যার গ্রীষ্মোদ্যানে লইয়া গেল। কপালগুণে তখন বাগানে কোন পাহারাওয়ালা ছিল না; কাজেই কলু রাজাকে নিরাপদে পুকুরের ধারে রাখিয়া আসিল। রাজা মাঝরাত্রির পর তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার অসহায় পোষ্যটিকে একলা রাখিয়া যাইতে কলু বেচারা প্রথমে ভয় পাইতেছিল, কিন্তু বিক্রমের অনুরোধে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইল। স্নেহশীল লোকটি হৃদয়ে নানা আশঙ্কা লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

কলু চোখের আড়ালে চলিয়া যাইবার পর রাজা কোন রকমে অল্প জলে নামিয়া অতিকষ্টে স্নান করিয়া আসিলেন। তার পর উপরে উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া পূজা করিতে বসিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টার পর পূজা সাঙ্গ হইলে তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, প্রায় দুপুর রাত্রি হইয়াছে। তখন তিনি উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে নিজের আবিষ্কৃত মন-মাতান অপূর্ব্ব দীপক-রাগিণীতে গান গাহিয়া উঠিলেন।

এই রাগিণীর গুণে বিক্রম আকাশের ও অগ্নির অদৃশ্য ভূতদের নিজ দাস করিয়া লইয়াছিলেন। বিক্রম ও এই রাগিণী অভিন্ন ছিলেন। এই রাগিণী বিক্রমের আর একটি নাম ছিল বলিলেও হয়। অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী রাজা দীপক-রাগিণীতে গান ধরিবামাত্র শহরের সমস্ত আলো আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠিল এবং লোকে শুইতে যাইবার সময় যে সমস্ত আলো নিবাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল। দীপক-রাগিণীর এমনই আশ্চর্য্য শক্তি! গানের সুর ক্রমশঃই উচ্চে উঠিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলোগুলি উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। আবার সুর নামিতে নামিতে অবশেষে থামিয়া গেল, সেই সঙ্গে আলোগুলিও ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া নিবিয়া গেল; সমস্ত শহর আবার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। যখন আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সে সময় রাজকন্যারও ঘুম

ভাঙিয়া গিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিবামাত্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের কার্য্য। রাজকন্যার বহুকাল হইতে জগদ্বিখ্যাত রাজা বিক্রমকে দেখিবার ও তাঁহাকে বিবাহ করিবার সাধ ছিল। কাজেই এমন জিনিষ আবিষ্কার করিয়া তাঁহার খুবই আনন্দ হইল। তিনি জানিতেন যে, রাজা ছদ্মবেশে এদেশে আসিয়াছেন, এবং জাদুবলে শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে তিনি এক কলুর গৃহে আছেন। ইহার বেশী তিনি আর কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

এদিকে দুপুর রাত্রি হইয়া যাইবার পর কলু আসিয়া রাজাকে বাড়ী লইয়া গেল এবং তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া আপনিও শুইতে গেল। সূর্য্য উঠিল, কিন্তু রাত্রির পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বেচারা কলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তখনও তাহার ঘুম ভাঙে নাই। সেই সময় একদল রাজকর্ম্মচারী আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া খবর দিল, রাজকন্যা তলব করিয়াছেন। বেচারা ভয়ে কাঁপিতেছিল; সে ভাবিয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার রাত্রের কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। রাজকন্যার নিকট হাজির হইয়া দেখিল, শহরের যত কলু সব সেখানে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই দেখিয়া তাহার একটু সাহসের সঞ্চার হইল, নিশ্চয়ই তাহার রাত্রির ব্যাপারের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সে অন্যান্য কলুদের সঙ্গে আসিয়া জুটিবার পর রাজকন্যা কর্ম্মচারীদের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব কলুরা কি এসেছে? কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি তো?' কর্ম্মচারীরা সকলের আগমন-সংবাদ দিলে রাজকন্যা কলুদের বলিলেন, 'তোমরা সব শোন, কাল সকাল ছটার মধ্যে তোমরা প্রত্যেকে আমায় এক লক্ষ মণ তেল দিয়ে যাবে। যদি না দিতে পার, তা'হলে তোমাদের সপরিবারে ঘানিতে ফেলে পেষা হবে।' এই বলিয়া তিনি তাহাদের বিদায় করিয়া দিলেন। কলুরা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজকন্যার অপূর্ব্ব খেয়ালকে অভিসম্পাত করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এদিকে সেই কলু চীনা রাজকুমারীর প্রাসাদ হইতে দুঃখিত নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল; কারণ এরূপ অবস্থায় ঝগড়া করাই স্বাভাবিক। কলুনী স্বামীর বিরক্তির কারণ শুনিয়া রাগে আগুন হইয়া বলিল, 'ওরে গাধা, এই দেখ্ তোর বোকামির ফল! আমি না তোকে বলেছিলাম যে এ অলুক্ষণে নুলোটাকে বাড়ীতে রাখিস না? ও যে-দিন থেকে বাড়ীতে ঢুকেছে, সেই দিন থেকে আমাদের দুরবস্থা আরম্ভ হয়েছে, আর আজ তো একেবারে চরম অবস্থা। এত তেল তুই কোথা থেকে যোগাড় করবি? কাল রাজকন্যার কাছে কি বলে জবাবদিহি করবি? আমাদের ভাগ্যে মরণই আছে। আর, এ তোর বোকামির জন্যই হল।' এই বলিয়া সে খুব উচ্চকণ্ঠে বিলাপ আরম্ভ করিল। বেচারা কলু কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া পাইল না। সে জানিত যে তাহার পোষ্যের কোনই দোষ নাই। সেদিন তাহাদের বাড়ী ঝাঁট দেওয়া হইল না, উনানেও আগুন পড়িল না; সমস্ত পরিবার অনাহারে কাঁদিয়া দিন কাটাইল। বেচারা অসহায় বিক্রম সারাদিন অনাহারে ঘানির উপর বসিয়া রহিলেন; সন্ধ্যা হইলে কলুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কি হয়েছে? এখনও আটা মাখাই বা কেন হল না? আর খাবারই বা কেন হল না?' কলু এতক্ষণ ক্রমাগত কাঁদিতেছিল, আর তাহার স্ত্রী

তাহাকে ও বিক্রমকে যথাসাধ্য গালি দিয়া যাইতেছিল। কাজেই অনেক কষ্টে ইহার কারণ জানা গেল।

রাজা বিক্রম বলিলেন, 'বাবা, আমাদের যখন মরতেই হবে, তখন মানুষের মতন মরাই ভাল। কেন মিথ্যে না খেয়ে যমের দোরে এগিয়ে যাই? যম আমাদের সুস্থ সবল নিয়ে গেলেই ভাল। খালি পেটে মরে লাভ কি? যাও গিয়ে খাবার তৈরি কর।' এই রকম অনেক বুঝাইবার পর কলু ও তাহার ঝগড়াটী স্ত্রী রান্নাবান্না করিয়া, এই তাহাদের শেষ আহার ভাবিয়া খাইতে বসিল। হতভাগ্য দম্পতি সকালের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুর্ভাবনায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল, অবশেষে রাত্রিশেষে ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবামাত্র বিক্রম ধীরে ভৈরবী রাগিণীতে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার রক্ষক ভূত 'বীর'গণ জোড় হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'হে অগ্নিকুলপ্রদীপ, আপনি আর কতদিন আপনার অপূর্ব্ব মহিমা লুকিয়ে রাখবেন? আর কতদিন এরূপ অসহায় অবস্থায় থাকবেন? আপনার কি ইচ্ছা বলুন, আমরা আজ্ঞা পালন করতে প্রস্তুত।' রাজা বলিলেন, 'বন্ধুগণ, আমি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করব। কিন্তু তোমাদের এখন আমাকে আগের মত সাহায্য করতে হবে। এখন এক লক্ষ মণ উৎকৃষ্ট তেল এনে দাও।' বীরগণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং এক নিমেষের মধ্যে কলুর কুটীর ও তাহার কাছাকাছি সমস্ত রাস্তা-ঘাট হাজার হাজার কালো কালো তেলের ভাঁড়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কলু কিছুক্ষণের মত ঘুমাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার ভাল ঘুম হয় নাই। সে কত সব ভীষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল। শেষ স্বপ্নটা এমন ভয়ঙ্কর যে কলু ভয়ে চীৎকার করিয়া বিছানা হইতে লাফ দিয়া পড়িল। চীৎকারে পাড়ার লোক জাগিয়া গেল। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, পেয়াদারা তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে, আর হাত-পা বাঁধিয়া মশানে লইয়া যাইতেছে। চোখ মেলিবার পরও তাহার কুস্বপ্ন ভাঙিয়া যায় নাই। সারি সারি তেলের ভাঁড় দেখিয়া সে সেগুলাকে সৈন্য মনে করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, 'ওগো রক্ষা কর গো, এরা আমায় খুন করতে এসেছে।' কিছুক্ষণ পরে যখন দেখিল যে সৈন্যেরা নড়েও না, চড়েও না, তখন তাহার মনে হইল এ সমস্তই স্বপ্ন। এত তেলের ভাঁড় দেখিয়া তাহার দুঃখ সুখ হইয়া দাঁড়াইল। সে স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই যে তাহার অসমর্থ পুত্রেরই এই অনুগ্রহ। সে খুব খুসী হইয়া ভোরবেলা আর সকলে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাসাদে গিয়া হাজির হইয়া বলিল, 'সমস্ত তেল প্রস্তুত হয়েছে।'

রাজকন্যার কার্য্যসিদ্ধি হইল। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে এই কলুর ঘরেই বিক্রমাদিত্য আছেন, কারণ প্রসিদ্ধ 'বীরগণ' ছাড়া আর কেহ এত অল্প সময়ে এত তেল আনিয়া দিতে পারে না। কাজেই অন্যান্য যাহারা নিজেদের অক্ষমতার কথা জানাইতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি কেবল সেই দরিদ্র কলুকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সকলে চলিয়া যাইবার পর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'ওগো কলু, তোমার যদি প্রাণের মায়া থাকে তো বল, কাকে বাড়ীতে রেখেছ।' কলু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'বাড়ীতে আমার স্ত্রী ও একটি নিরপরাধ অসহায় নুলো ছাড়া আর কোন প্রাণী

নেই। এই অসহায় লোকটিকে আমি চকের মাঝখান থেকে কুড়িয়ে এনে পুত্র বলে গ্রহণ করেছি।' রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে এই লোকটিই বিক্রমাদিত্য। তিনি কলুকে বলিলেন, 'শোন, আর দু'মাস পরে পূর্ণিমার দিনে আমার পিতা চীনসম্রাট স্বয়ম্বর-সভা করবেন, তাতে দেশ-বিদেশের সব রাজারাজড়ারা আসবেন। তুমিও সেদিন তোমার নুলো ছেলেকে নিয়ে এসে একটা বেশ ভাল জায়গায় বোস।' এই বলিয়া রাজকন্যা তাহাকে বিদায় দিলেন।

বাড়ী আসিয়া কলু স্ত্রীকে রাজকন্যার স্বয়ম্বরের খবর দিল এবং রাজার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'বাছার আমার কপাল ভাল; তুমি রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখতে পাবে। আমি তোমায় সেখানে বয়ে নিয়ে যাব, রাজকন্যা নিয়ে যেতে বলেছেন।' রাজা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে রাজকন্যা তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন, এইবার তিনি শীঘ্রই রাজকন্যাকে লাভ করিবেন। বরণ করা ভিন্ন আর কি জন্যই বা রাজকন্যা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবেন!

স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে করিতে গোলমালে দুই মাস কাটিয়া গেল। অবশেষে স্বয়ম্বরের দিন উপস্থিত হইল।

স্বয়ম্বর-সভায় মহা জাঁকজমক! কার সাধ্য সে দৃশ্য বর্ণনা করে? কত রাজা রাজপুত্র সম্রাট পৃথিবীর নানা দেশ হইতে আসিয়া চীন-রাজধানীর চারিধারে তাঁবু ফেলিয়াছেন। যে মণ্ডপে এই সকল মুকুটশোভিত পুরুষগণ বসিবেন তাহা তাঁহাদেরই মত বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। সকলে কম্পিত হৃদয়ে রাজকন্যার আশায় বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেকেই মনে করিতেছিলেন, যাহার গলায় বরমাল্য পড়িবে আমিই সেই ভাগ্যবান। এই বিরাট সভার এক কোণে সকলের দৃষ্টির বাহিরে কলু বিক্রমাদিত্যকে কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার শ্রেষ্ঠ পোষাক পরিয়া ও তাহার পুত্রকে যথাসাধ্য সাজাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোষাক এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা গরীব ভৃত্যের পোষাক হইতেও বহুগুণে নিকৃষ্ট। এখানে তাহার প্রবেশ অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে মনে করিয়া সে এক কোণে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার প্রাণ শুকাইয়া আসিতেছিল।

অবশেষে দুই সখীর সহিত রাজকন্যা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী, সৌন্দর্য্যে সমস্ত সভা আলোকিত করিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলে অবাক হইয়া তাঁহার মনোহর মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার হাতে এক ছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি ইহাদের মধ্যে যাহাকে খুঁজিতেছিলেন তাহাকে না দেখিতে পাইয়া বার বার চাহিতে লাগিলেন। ভালবাসার দৃষ্টি কে এড়াইতে পারে? কলু যদিও এক কোণে লুকাইয়া ছিল, কিন্তু রাজকন্যার চক্ষে পড়িয়া গেল; তিনি তৎক্ষণাৎ দৃঢ়পদে সেইদিকে চলিলেন। তার পর, কি আশ্চর্য্য! রাজকন্যা যত ধনী-মানী-নিমন্ত্রিতদের চোখের সামনে সেই নুলোর গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। লজ্জায় চীনসম্রাটের মাথা হেঁট হইয়া গেল। সমাগত সকলে রাজকন্যার এরূপ অদ্ভুত নির্ব্বাচন দেখিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া গেলেন।

কিন্তু স্বয়ম্বর-সভার মধ্যে বরণ করা হইয়াছে, এখন আর কোনও উপায় নাই। চীনসম্রাট বিবাহে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন, এবং কলুকে ডাকিয়া পরদিন যথাযোগ্য সমারোহ করিয়া বর আনিতে বলিলেন। এরূপ বিবাহের ব্যয় যোগানো গরীব কলুর পক্ষে অসম্ভব জানিয়া রাজা তাঁহার মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষকে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

কলু বরকে কাঁধে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং স্ত্রীকে এই সুখবর দিল। তারপর সে বিবাহের আয়োজন করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজা বিক্রম তাহাকে অনাবশ্যক আয়োজন করিতে বারণ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমাদের এ-সব আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। এ-সব কোন কাজের নয়। তুমি কিচ্ছু কোরো না।' কলু এ-রকম আশ্চর্য্য অনুরোধ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। যা হোক, সে রাজার কথাই শুনিল। যে-সকল রাজকর্ম্মচারী বিবাহের আয়োজন করিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও মানী বিক্রমাদিত্য তাড়াইয়া দিলেন। রাত্রি হইল। তখন বিক্রমাদিত্য আর একবার তাঁহাকে রাজকন্যার উদ্যানে লইয়া যাইতে পিতাকে বলিলেন। কলু অনিচ্ছাসত্ত্বেও লইয়া গেল।

বিক্রমকে পুকুরের ধারে নামাইয়া দিবার পর তিনি কলুকে এই বলিয়া বিদায় দিলেন, 'বাবা, তুমি এখন যাও, কিন্তু ভোর হবার আগে এসে আমাকে নিয়ে যেও।' কলু বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল, কিন্তু অত্যন্ত কৌতূহল হওয়াতে আর এক রাস্তা দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিক্রম কি করেন দেখিবার জন্য এক কোণে লুকাইয়া রহিল।

রাজা বিক্রম স্নান করিয়া উঠিয়া পূর্ব্বের মত দীপক-রাগিণী গাহিতে আরম্ভ করিলেন। গান শুনিয়া কলু আনন্দে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গানের অপূর্ব্ব সুর আবার যখন আকাশে ধ্বনিত হইয়া উঠিল তখনই আবার সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারে রাজকন্যার আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কিন্তু এবার আর তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন না; তৎক্ষণাৎ এক অপ্সরার মূর্ত্তি ধরিয়া সোনার পাখা মেলিয়া জাদুবলে আপনার প্রাসাদ ছাড়িয়া যেখান হইতে গানের শব্দ আসিতেছিল সেইখানে উড়িয়া গেলেন। তিনি রাজা বিক্রমকে দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখিলেন; কিন্তু রাজা তাঁহাকে নূতন রূপে চিনিতে পারিলেন না। অপ্সরা বিক্রমের নিকট আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি আপনার গান শুনে সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন।' রাজা বিনীতভাবে বলিলেন, 'হে ইন্দ্রলোকবাসিনি, আমার নষ্ট হস্তপদ ফিরিয়ে দিন।' অপ্সরা রাজার এই অনুরোধ শুনিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার কাটা হাত-পা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তার পর তিনি সেগুলা জোড়া লাগাইয়া দিবামাত্র রাজা সম্পূর্ণ দেহ লাভ করিলেন। অপ্সরা তখন আপনার প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

তখন রাজা তাঁহার চারি 'বীর'কে স্মরণ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে মহা বলীয়ান বীরগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি আজ্ঞা, মহারাজ? আমরা আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত আছি।' রাজা বলিলেন, 'হে আমার প্রাণের বন্ধুগণ, আমি বহুকাল জপ-তপ করে তোমাদের লাভ

করেছি। তোমরা চিরকাল বিশ্বস্তভাবে আমার সেবা করেছ। এখন তোমাদের স্বাধীনতার দিন আসছে, শীঘ্রই তোমরা মানুষের দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু যিনি বুদ্ধিহীন তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়েছেন, এবং যখন তোমরা লক্ষ্যহীন হয়ে শূন্যে ঘুরে বেড়াতে তখন যিনি তোমাদের জ্ঞানদান করেছিলেন, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। যাও, পৃথিবীর চারিদিক থেকে আমার সৈন্যদের সংগ্রহ করে আন। শহরের চারিদিকে বহু ক্রোশ জুড়ে আমার শিবির ফেলে দাও। সোনা-রূপার সাজ-পরা হাজার হাতী ঘোড়া আমার জন্য প্রস্তুত করে রাখ। আমি যে কুঁড়েঘরে থাকি, তাকে রাজপ্রাসাদ করে দাও, আর দাসদাসী মণিরত্নে সে প্রাসাদ পরিপূর্ণ করে দাও। বেশী আর কি বলব, সম্রাট বিক্রমাদিত্যের উপযুক্ত যা-কিছু চাই, সমস্ত করে দাও। এ-সমস্তই কিন্তু ভোর হওয়ার আগে চাই।'

দরিদ্র কলু এতক্ষণ লুকাইয়া এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতেছিল। সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।' রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, 'বাবা, আমাকে চিরকাল তোমার পুত্র বলে জেন। আমার বিপদের সময় তুমি আমায় যে দয়া করেছ, সে ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। এখন থেকে তুমি আমার পিতা হলে এবং আমার সঙ্গে আমার রাজ্য ভোগ করবে। চল এখন বাড়ী যাওয়া যাক; ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক রাঙা হয়ে এল।'

তাড়াতাড়ি বাগান ছাড়িয়া তাঁহারা বাড়ী চলিলেন। কয়েক ঘণ্টা আগে যেখানে তাহার ছোট্ট কুটীরখানি ছিল এখন সেখানে এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, আর তাহার সেই ঝগড়াটী স্ত্রী রাণীর বেশে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছে দেখিয়া কলু অবাক হইয়া গেল। তাহাদের পোষ্যপুত্রের পরিচয় পাইয়া ও এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া কলুনীর আশ্চর্য্য পরিবর্তন হইয়াছে। যে আগে শাপ আর গালি ভিন্ন কথা কহিত না, সে-ই এখন ভক্তিভরে একেবারে অবনত। এদিকে সূর্য্য উঠিতে না-উঠিতে 'বীর'গণ প্রভুর সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। শীঘ্রই চীনসম্রাটের নিকট খবর গেল যে রাত্রির মধ্যে এক প্রবল সৈন্যদল শহর ঘেরাও করিয়াছে। তাহারা কাহার সৈন্য এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, তাহা এখনও কেহই জানে না। সম্রাট তৎক্ষণাৎ খালি পায়ে খালি মাথায় বশ্যতার চিহ্নস্বরূপ খড়-কুটি মুখে করিয়া নূতন শত্রুর সহিত সন্ধি করিতে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। রাজা শীঘ্রই শ্বশুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া তাঁহার সকল ভয় ভাঙিয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা স্বয়ম্বর-সভায় যে নুলোকে বরণ করিয়াছিলেন, সে-ই যশস্বী মহারাজ বিক্রমাদিত্য, দেখিয়া চীনসম্রাটের যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই খবর যখন শহরময় ছড়াইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বদিন যে সকল রাজা-রাজড়ারা বিরক্ত হইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন এবং নুলোটাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অত্যন্ত বিনীতভাবে আসিয়া তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী বিক্রমের পায়ে পড়িলেন।

খুব জাঁকজমকের সহিত বিবাহ হইয়া যাইবার পর সন্ধ্যাবেলা 'বীর'দের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক মণ্ডপে সমাগত রাজগণকে নাচওয়ালীদের উচ্চ নাচ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। বিক্রম এবং

রাজকন্যা এক মঞ্চে বসিলেন, আর সকলে তাহার নীচে বসিলেন। নাচ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় খবর আসিল, একদল জাদুকর আসিয়াছে, তাহারা নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বাজি দেখাইতে পারে, অনুমতি পাইলে ভিতরে আসিয়া রাজগণকে বাজি দেখাইবে। রাজা তাহাদিগকে ভিতরে আনিতে আদেশ করিলেন। তাহারা ঢুকিবামাত্রই রাজা তাহাদের দুই দলপতিকে চিনিতে পারিলেন। তাহারা আর কেহ নহে, রাজার পরম শত্রু সেই যোগী এবং সেই পদচ্যুত মন্ত্রী। রাজা তাহাদের দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া গেলেন। রাজকন্যা ইহার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'কোন ভয় নেই, ওরা হিংসার ফলে নিজেদের হাতে নিজেরাই মরবে।'

জাদুকরদিগকে বাজি দেখাইতে বলা হইলে তাহারা মরা মানুষকে বাঁচাইয়া দেখাইবে বলিল। সেই মন্ত্রী একটা সিন্দুকের ভিতর হইতে আপনার পুত্রের মৃতদেহ বাহির করিয়া মাটিতে শোয়াইল এবং নিজে তাহার বুকের উপর বসিল। যোগী চারিধারে আগুন জ্বালাইয়া মাঝখানে বসিল। অন্য জাদুকরেরা ঢাক-ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিল, আর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী ও তাহার মৃত পুত্র শূন্যে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই আকাশে অস্ত্রের ঝন্ঝনা ও যুদ্ধের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। তারপর মাটিতে একখানা হাত পড়িল, কিছুক্ষণ পরে একখানা পা, তারপর ধড়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরটাই পড়িল। তখন মন্ত্রী নামিয়া আসিয়া বলিল, 'হে রাজগণ ও সর্দ্দারগণ, এই দেখুন, আপনাদের সামনে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে। আমি একে জীবিত করে তুলব।' এই বলিয়া সে সমস্ত শরীরটা জোড়া দিল। যোগী ধুনীর ছাই তুলিয়া দিল। সেই ছাই মৃতদেহের উপর ছড়াইয়া দিবামাত্র সে বাঁচিয়া উঠিল এবং দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'বাবা, আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দাও।' মন্ত্রী উত্তর করিল, 'তুমি বাঘ হয়ে আমাদের শত্রুকে খাও।'

তৎক্ষণাৎ সেই পুনর্জ্জীবিত শবটা বাঘ হইয়া রাজার উপর লাফাইয়া পড়িল। রাজকন্যা হাত নাড়াতে বাঘটা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া মন্ত্রীর ঘাড়ে গিয়া পড়িল, এবং যোগী বাধা দিবার আগেই তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া মণ্ডপ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যোগী সঙ্গীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া আগুনের বেড়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, রাজকন্যা আর একবার হাত নাড়াতে সেইখানেই অচল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন রাজকন্যা বজ্রগম্ভীর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওরে দুরাচার, তুই তোর ঈশ্বরদত্ত শক্তি যতদূর সম্ভব নীচ কাজে প্রয়োগ করেছিস; তোর এই কাজের জন্য তুই যা প্রতিফল পাবি, আমি তার থেকে বেশী কোন শাস্তি দিতে পারি না। এখন থেকে তুই বনের পশুপক্ষীর মত বুদ্ধিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াবি।' তিনি আর-একবার হাত নাড়িবার পর যোগী বুদ্ধিহীন হইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার জ্ঞানপ্রদীপ রাজকন্যার হস্তসঞ্চালনে চিরকালের জন্য নিবিয়া গেল। বিক্রম নববধূকে লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলে প্রজাদের মধ্যে হর্ষকোলাহল পড়িয়া গেল এবং তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।



'মা, তোমার কিসের দুঃখ ?'
।। রাজপুত্র মহবুবের কথা ।।



রাজপুত্র খাজা ও খিজিরকে প্রণাম করিলেন।
।। রাজপুত্র মহবুবের কথা ।।



'মা, তুমি কে ?   পরী; না দেবী, না অপ্সরা ?'

॥ রাজপুত্র মহবুবের কথা ॥



মহ্‌বুব ও তাঁহার মা সমুদ্র পার হইতেছেন।

॥ রাজপুত্র মহবুবের কথা ॥

রাজপুত্র মহবুবের কথা

সেকালে পারস্যদেশে মনসুর-ই-আলম (ভুবনবিজয়ী) নামক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। মানুষ যাহা কিছু চায়, সমস্তই তাঁহার ছিল, ধনরত্ন সৈন্যসামন্ত কিছুরই অভাব ছিল না। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা পরম সুখে থাকিত। সকলেই তাঁহার জ্ঞানের ও সদ্‌গুণের প্রশংসা করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজার এত ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার কেহ ছিল না; তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই। একদিন তিনি রাজ্যের যত জ্যোতিষীদের ডাকিয়া জড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ দিন, কোন্ ঘণ্টায়, কোন্ মুহূর্তে জাত শিশু শক্তিশালী রাজা হতে পারবে ?' জ্যোতিষীরা গণনা করিয়া বলিলেন, 'প্রভু, গত রবিবার দুপুর-রাত্রে যে শিশুর জন্ম হয়েছে, সে খুব সৌভাগ্যবান এবং রাজোচিত গুণে মণ্ডিত হবে। মহারাজ যদি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করতে চান, তবে ওই দিন ওই ঘণ্টায় যার জন্ম হয়েছে,—তাকেই গ্রহণ করবেন।'

রাজা এই কথা শুনিয়া প্রধান মন্ত্রীকে ঐ সময় কাহার গৃহে পুত্র জন্মিয়াছে জানিতে হুকুম করিলেন। সমস্ত রাজ্যময় দূত পাঠান হইল, কিন্তু খবর আসিল, ঐ সময়ে এক কসাই ছাড়া আর কাহারও গৃহে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। রাজা কসাইকে ডাকিয়া তাহার ছেলেটি চাহিলেন। কসাই বড়ই গরীব ছিল। সে স্বীকৃত হইয়া বলিল, 'মহারাজই আমাদের প্রাণ ও দেহের মালিক। আপনি যা হুকুম করবেন, আমরা তাই তামিল করব।' সদাশয় রাজা বলিলেন, 'বন্ধু, আমি রাজা বলে তোমার ছেলেটিকে চাইছি তা নয়, আমি একজন সাধারণ লোকের মতই চাইছি। তুমি কি স্বেচ্ছায় তোমার ছেলেটিকে আমায় দিতে পার ? যদি তা না হয় তাহলে আমি তাকে চাই না।' কসাই উত্তর করিল, 'মহারাজ, আমি খুসী হয়েই আপনাকে আমার ছেলেটি দিচ্ছি। আমার ছেলে রাজার পোষ্যপুত্র হবে, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।' তারপর শিশুটিকে আনিয়া যথানিয়মে গ্রহণ করা হইল।

কসাইয়ের পুত্র এখন রাজপুত্র কাসব নামে পরিচিত। রাজপুত্র কিছু বড় হইবার পর রাজা তাহার শিক্ষার জন্য অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান শিক্ষক রাখিয়া দিলেন। রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে তাঁহাদের অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি সাবালক হইবার পর রাজা তাঁহাকে নিজ রাজ্যের একটি উৎকৃষ্ট প্রদেশের শাসনের ভার দিলেন। এদিকে এত বড় একটা ক্ষমতা পাইয়া রাজপুত্র যথেচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন; তাঁহার নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভয়ে রাজ্যসুদ্ধ লোক দিনরাত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিত। এই সকল কুশাসন এবং অত্যাচারের কথা প্রতিদিনই রাজার কানে যাইত, কিন্তু তিনি নিজে ভাল লোক ছিলেন বলিয়া এ-সকল কথা ততটা বিশ্বাস করিতেন না।

এতদিন রাণীকে লোকে বন্ধ্যা মনে করিত, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে শোনা গেল। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি নিজ সন্তানের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার সে নিরাশা দূর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র কাসবের নিকট এই

বলিয়া এক দূত পাঠাইলেন, 'বৎস, আনন্দ উৎসব কর, কারণ শীঘ্রই আমাদের পরিবারে আর একজন লোক বাড়বে। তোমার মা মহারাণীর সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে, জ্যোতিষীরা বলছেন, তাঁর পুত্রসন্তান হবে। তোমার একটি ভাই হবে শুনে নিশ্চয়ই তুমি খুব খুসী হবে।' রাজপুত্র কাসব এই সংবাদ পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'এতদিনে আমার দুর্গ্রহের উদয় হয়েছে; আমার এখন যতই মান থাকুক না, রাজার নিজ পুত্র হলে আর কে কসাইয়ের পুত্রকে গ্রাহ্য করবে? নিশ্চয়ই আমার ভাইয়ের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমার পতন আরম্ভ হবে। ওঃ, আমার এই পদ মান গেলে কি কষ্টটাই হবে! আমি যদি কসাইয়ের ঘরেই থাকতাম, তাহলে নিজের ভাগ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম, কিন্তু এখন একবার রাজভোগের আস্বাদন পেয়ে ছাড়া বড় কষ্টকর। আমায় রাজধানীতে গিয়ে দেখতে হচ্ছে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখতে পারি কি না।' এইরূপ ভাবিয়া রাজপুত্র এক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়িয়া রাজধানীর দিকে চলিলেন। প্রায় দুপুর রাত্রে রাজপ্রাসাদে পৌঁছিয়া তিনি একেবারে রাজার মহলে ঢুকিলেন। রাজকুমারকে সকলেই চিনিত, কিন্তু কেহই তাঁহার কুঅভিপ্রায় জানিত না। কাজেই কেহই তাঁহাকে ঢুকিতে বাধা দেয় নাই। সেখানে গিয়া তিনি রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের এক ঘায়ে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা তলোয়ার হাতে করিয়া রাণীর সন্ধানে চলিলেন; কিন্তু তিনি কুমারের আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত দাসীর সঙ্গে এক গুপ্ত দরজা দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; তাহারা তাঁহাকে ঘোড়ার পিঠে করিয়া রাত্রির মধ্যে রাজধানীর অনেক দূরে এক বনে উপস্থিত করিল; রাণী সেখানে তাহাদের বিদায় দিয়া বলিলেন, 'বিশ্বাসী সঙ্গীগণ, তোমরা এখন যাও। আমায় এই নির্জ্জন বনে থাকতে দাও। যদি আমি না খেতে পেয়ে কিম্বা বাঘ ভালুকের মুখে পড়ে প্রাণ হারাই, তাহলে আমার এই একটা সান্ত্বনা থাকবে যে আমি কসাইয়ের হাতে মরিনি। আমার কপালে যা আছে তাই হবে। তোমরা এখন যাও।' বেচারী দাসীরা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

রাণী সেইখানে বসিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এক অবস্থাপন্ন কৃষক সেইখান দিয়া যাইতেছিল। সে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রাণীর মত মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, 'মা তুমি কে? পরী, না দেবী, না অপ্সরা?' রাণী উত্তর করিলেন, 'বাছা, আমি অপ্সরাও নয়, দেবীও নয়, পরীও নয়, দুঃখিনী মানবী। আমি এই দেশের রাণী ছিলাম, এখন গৃহহারা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' কৃষক তাঁহার উচ্চ বংশের পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'মা, আমি আপনার স্বামীর একজন জায়গীরদার; এই যে মাঠ আর গ্রাম সব দেখছেন, এ-সমস্তই আপনাদের। আপনি আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা গরীব চাষাভূষো, আমাদের সাদাসিধে ঘরকন্নার মধ্যে আপনি রাজবাড়ীর জাঁকজমক না পেলেও সুখে থাকবেন।' রাণী তাহার কথায় রাজী হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন, এবং সেখানে তাহার মামাতো বোন বলিয়া পরিচয় দিলেন।

যথাসময়ে রাণীর এক পুত্র জন্মিল। তাহার রূপের আলোয় সমস্ত বাড়ী আলো হইয়া উঠিল। সমস্ত

গ্রামে রটিয়া গেল, কৃষকের বোনের গর্ভে এক দেবশিশুর জন্ম হইয়াছে। রাণী তাহার নাম রাখিলেন মহবুব-ই-আলম (বিশ্বপ্রিয়)। রাজপুত্র মহবুব কিছু বড় হইবার পর গ্রামে জাট ছেলেদের যে পাঠশালা ছিল, তাহাকে সেইখানে পাঠান হইল। সেখানে সে শীঘ্রই পড়াশুনায় ও কুস্তি প্রভৃতিতে সঙ্গীদের ছাড়াইয়া উঠিল। জাট ছেলেরা গুলিডাণ্ডা খেলিতে ভালবাসিত, কিন্তু মহবুব তীরধনুক দিয়া খেলা করিত। সে কোনপ্রকারে একটা চলনসই ধনুক এবং কতকগুলি তীর তৈরী করিয়া যখন-তখন চারিদিকে বাণ ছুঁড়িত। তাহাকে কেহই এ বিদ্যা শিখায় নাই বটে, কিন্তু তবু সে শীঘ্রই একজন বড়দরের তীরন্দাজ হইয়া উঠিল, আর অনেক দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করিতে পারিত।

এদিকে মহবুবের রাজ্যাপহারী ভাই এক মস্ত কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করিল। তাহাতে রাজ্যের সমস্ত তীরন্দাজদের যোগ দিতে অনুরোধ করা হইল। যে জয়লাভ করিবে তাহার জন্য চারিটি পুরস্কার ছিল; প্রথম, পাঁচশ' মোহরের একটা থলি ; দ্বিতীয়, জয়ীর মনের মতন একটা রাজপোষাক; তৃতীয়, রাজার আস্তাবলের যে কোন একটা ঘোড়া ; চতুর্থ, অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত একটা যুদ্ধসজ্জা। এই মস্ত ব্যাপারের কথা সেই সুদূর কোণের গ্রামেও পৌঁছিল। মহবুব এই খবর শুনিয়া মাকে না বলিয়া শহরের দিকে যাত্রা করিলেন। বেচারী রাণী মনে করিলেন, তাঁর ছেলে পাঠশালায় গিয়াছে, কিন্তু মহবুব সেখানে যান নাই, তিনি শহরে চলিয়াছেন। রাত্রি হইল, তখনও রাজপুত্র ফিরিলেন না ; চারিদিকে তাঁহার খোঁজ করিতে লোক পাঠান হইল। কিন্তু কোনই ফল হইল না ; তাঁহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। রাণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, মহবুব না ফিরিলে তিনি অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন না।

ওদিকে রাজপুত্র একদল তীরন্দাজের সঙ্গে শহরে পৌঁছিয়া তাহাদের সঙ্গেই এক সরাইয়ে আশ্রয় লইলেন। তিনি শীঘ্রই তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকেও যেন লক্ষ্যভেদ করিতে দেওয়া হয় এই প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সুন্দর চেহারা আর মিষ্ট স্বভাব দেখিয়া তাহারা বেশ খুসী হইয়াই নিজেদের দলে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইল। তার পরদিন কৃত্রিম যুদ্ধের দিন স্থির হইয়াছে। কাজেই রাজপুত্র তীরন্দাজদের সঙ্গে ভোরবেলাই যাত্রা করিলেন। সেখানে দর্শকদের মস্ত মেলা হইয়াছে, সুসজ্জিত মঞ্চের মধ্যে রত্নখচিত উচ্চ সিংহাসনের উপর রাজাও দর্শকরূপে বসিয়াছেন। তিনি একটা সঙ্কেত করিবামাত্র তীরন্দাজরা রঙ্গভূমিতে আসিয়া ঢুকিল, এবং একে একে লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিল। কেহ কেহ লক্ষ্যের খুব কাছে বাণ মারিয়াছিল, কেহ বা আরও কাছে মারিয়াছিল, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারে নাই। রাজকুমার মহবুব দলের মধ্যে সকলের ছোট ছিলেন, এখন সকলের শেষে তাঁহার পালা। তাঁহার বাণ লক্ষ্যের ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে প্রশংসাধ্বনি উঠিল—শব্দে কান কালা হইবার যোগাড়। মেলার সকলেই রাজকুমারের আশ্চর্য্য লক্ষ্যভেদের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

রাজা তাঁহাকে পাঁচশ' মোহরের এক থলি পুরস্কার দিলেন, তারপর উজীরকে ডাকিয়া তাঁহাকে তাঁহার পোষাকের ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন। উজীর তাঁহাকে সেই ঘরে লইয়া যাইবামাত্র তিনি

তাঁহার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের পোষাকটি বাছিয়া লইলেন। পিতার পোষাক পরিয়া তিনি অস্ত্রশালায় চলিলেন এবং সেখানে গিয়াও, তাঁহার পিতা যুদ্ধে কিম্বা মৃগয়ায় যাইবার সময় যে-সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেন, ঠিক সেইগুলিই বাছিয়া লইলেন। অশ্বশালায় ঢুকিয়া রাজার প্রিয় ঘোড়াটির পিঠে চড়িয়া বসিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তিনি মেলার মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সমস্ত লোক নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, 'ওই দেখ, আমাদের প্রিয় মহারাজ আবার ফিরে এসেছেনও,' বলিয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাজপুত্রের পিতার সঙ্গে এত সাদৃশ্য ছিল যে সকলেই তাঁহাকে স্বর্গগত মহারাজ বলিয়া ভুল করিয়াছিল। লোকদের চীৎকারে কাসব ভয়ানক রাগিয়া চীৎকার করিয়া চাকরদের বলিতে লাগিল, 'ওই বোকা ছোঁড়াটাকে ধরে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে এস।' চাকরেরা চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া গোলমাল বাধাইয়া দিল ; আসলে এই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিবার তাহাদের একটুও ইচ্ছা ছিল না। তাই তারা মহবুবকে পলাইবার বেশ সুবিধা করিয়া দিল।

রাজকুমার শহরের বাহিরে আসিয়া সমস্ত তীরন্দাজদের জড় করিয়া তাহাদের মাঝখানে মোহরের থলিটা ফেলিয়া দিলেন ; তারপর ঘোড়া ছুটাইয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার মা দরজায় বসিয়া 'মহবুব, মহবুব' বলিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই রাণী একবার হাসিয়া উঠিলেন, এবং তার পরেই খুব কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমার ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফাইয়া পড়িয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তোমার এরকম ব্যবহারের মানে কি ? তুমি একই সময় হাসলে আবার কাঁদলে কেন ?' রাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাছা, আমি তোমাকে তোমার বাবার সাজপোষাক পরতে দেখে হাসলাম। আর কি-জন্য আমাদের এরকম অবস্থা হয়েছে মনে করে কাঁদলাম। এখন তুমি নিজের জন্মরহস্য জানতে পারলে আর আমার হাসিকান্নার কারণও শুনলে।'

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, 'মা, আমি লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে এর একটু একটু আভাস পেয়েছি, আর সেখানকার লোকেরা আমি আগেকার রাজার মত দেখতে বলে খুব চেঁচাচ্ছিল। কিন্তু তোমার কথায় আমার সন্দেহটা সত্য বলে বুঝলাম। মা, আমাদের কিন্তু এ দেশে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নয়। তুমি মনে করো না যে আমার বাবাকে যে হত্যা করেছে আমি তার ভয়ে একথা বলছি। তা নয়। কিন্তু আমি শপথ করছি যে যত দিন না এই বিশ্বাসঘাতক লোকটার মাথা কেটে এর প্রতিশোধ নেব ততদিন পর্য্যন্ত আমি এ দেশের অন্নজল স্পর্শ করব না। যত দিন না আমি আমার বাবার মৃত্যুর শোধ নেব, আর নিজে রাজা হয়ে এ দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নেব, তত দিন এ দেশের বাতাস পর্য্যন্ত আমার কাছে বিষ। মা, ওঠ, চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।'

কৃষক রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁর মন ফিরাইবার জন্য অনেক কান্নাকাটি করিলেন। কিন্তু মহবুব পর্ব্বতের ন্যায় অটল। এই দয়াল কৃষক ও তাঁর পরিবারের সকলকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহারও খুব দুঃখ হইতেছিল বটে, তবুও তিনি কিছুতেই আর সেখানে থাকিতে রাজী

হইলেন না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে বিদায় লইয়া মহবুব ও তাঁহার মা ভগবানকে সহায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

তাঁহারা পান আহার কিছু না করিয়া ক্রমাগতই চলিতে লাগিলেন। যতক্ষণ রাজ্যাপহারীর রাজ্য ছাড়াইয়া না গেলেন ততক্ষণ জলস্পর্শ করিলেন না। অনেক দিনের ক্ষুধাতৃষ্ণায় এবং ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া তাঁহারা কিছু চাহিয়া খাইবার মত ও ক্লান্ত পাগুলিকে একটু বিশ্রাম দিবার মত একটা আশ্রয় খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু সেখানে সেরূপ আশা নিতান্তই দুরাশা মনে হইতে লাগিল ; কারণ, সেটা পাহাড়ে জায়গা, দূরে কি নিকটে মানুষের কোন চিহ্নই ছিল না। অনেক খুঁজিবার পর একটা পাহাড়ের কোলে একটি ছোট মসজিদ দেখা গেল। তাঁহারা নিজেদের আধমরা শরীরগুলি কোন প্রকারে সেখানে টানিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলেন একখানা ছেঁড়া মাদুরে একজন ফকির বসিয়া আছেন। রাজকুমার 'ক্ষুধায় মরিতেছি' বলিয়া ফকিরের কাছে খাবার চাহিলেন। বৃদ্ধ ফকির একটা কুলুঙ্গীর দিকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'বাছা, ওখানে এক টুকরা রুটি আছে, তোমরা দুজনে নিয়ে খাও।' রাজকুমার সেখানে গিয়া দেখিলেন, এক টুকরা ধূলা-মাখা বাসি রুটি পড়িয়া আছে, এক গালও বোধ হয় হইবে না। রুটিটা মাকে আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি এটা খাও, একটু জোর পাবে। দুজনের পক্ষে তো যথেষ্ট নেই, তোমারই বেশী খাবার দরকার ; আমার শক্ত হাড়, এত দরকার করে না। মা, তুমি খাও।' কিন্তু রাণী কিছুতেই খাইবেন না। তিনি বলিলেন, 'বাছা, আমি বুড়ো হয়েছি, এ জীবনে সুখ দুঃখ অনেক ভোগ করেছি। আমি মরতে প্রস্তুত আছি। আমাকে মরতে দাও ; তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি বেঁচে থেকে তোমার কার্য্যসিদ্ধি কর।'

রাজকুমার এ সকল কথায় কানই দিলেন না, ক্রমাগতই মাকে খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি কেবল ফিরাইয়া দিতেছিলেন, আর রাজকুমার জোর করিতেছিলেন, এইরূপে অনেকক্ষণ গোলমাল চলিল। ফকির এই দেখিয়া বলিলেন, 'ওহে পথিক, তোমরা অকারণ ঝগড়া করছ কেন? দুজনেই খাও, দেখ তবুও শেষ করতে পারবে না।' এই শুনিয়া মাতা-পুত্র দুইজনেই খাইতে আরম্ভ করিলেন, রুটি যেমন তেমনই রহিল। খাইয়া তাঁহাদের পেট ভরিয়া গেল, তবু রুটি এক আঙুলও কমিল না। এই ধূলামাখা রুটির মতন এমন জিনিষ তাহারা জীবনে কখনও আস্বাদন করেন নাই। তার পর ফকির আর একটা কুলুঙ্গী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ওইখানে জল আছে।' রাজকুমার কাছে আসিয়া দেখিলেন, একটা ছোট্ট মাটির ভাঁড় রহিয়াছে। তাহাতে যে জল ছিল তাহা একজনের পক্ষেও যথেষ্ট নয়, সুতরাং কে জলপান করিবে এই লইয়া আবার তর্ক আরম্ভ হইল।

তখন ফকির বলিলেন, 'ওগো বাছা, আল্লার নাম ক'রে দুইজনেই জল খাও।' তখন তাঁহারা দুই-জনেই সেই ভাঁড়ের জল পান করিলেন, তাঁহাদের পিপাসা দূর হইয়া গেল ; কিন্তু জল এক ফোঁটাও কমিল না। তারপর ফকির বলিলেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথায়ই বা যাচ্ছ ? এ পাহাড়ের ওপারে তো আর যেতে পারবে না। ওপারে এক অতলস্পর্শ ঝোড়ো সমুদ্র আছে। কোন জাহাজ এ পর্যন্ত ওই

দুরন্ত সাগরে যেতে সাহস করেনি। তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।' কিন্তু রাজকুমার বলিলেন, 'ওগো সাধু ফকির, আমরা জন্মভূমিতে আর ফিরব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। তোমার পবিত্র হৃদয়-দর্পণে আমাদের দুঃখ-কাহিনীর ছায়া অনেকক্ষণই পড়েছে, আমরা যে কে তা বলবার আর দরকার নেই। ওগো সাধু, আমাদের এই যাত্রায় তুমি সাহায্য কর, তোমার তপস্যার বলে কিছুই অসাধ্য নয়।' ফকির উত্তর দিলেন, 'ঠিক বলেছ পথিক, পবিত্র হৃদয়ের প্রার্থনা আল্লা পূর্ণ করেন। কিন্তু আমার মত পাপী কি করতে পারে? যা হউক, দেশভ্রমণ করবার সময় আমি প্রকৃতির জিনিষের কয়েকটা গুণ আবিষ্কার করেছি। দেখি, যদি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি।'

তাঁহার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত মসজিদে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ফকির নিকটেই একটা বনে গিয়া ঢুকিলেন। কিছুক্ষণ পরে দুই টুকরা কাঠ হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন; কাঠ দুখানা সেই দেশের কোন এক রকমের একটা গাছের ডাল থেকে কাটা হইয়াছে। একটা টুকরা দিয়া এক হাত লম্বা একটা লাঠি হইল, আর একটা হইল মশাল। তার পর তিনি তাহাদের ডাকিয়া বলিলেন, 'এই জিনিষ দুটি তোমাদের ভীষণ বন ও বিশাল সমুদ্রের পারে নিয়ে যাবে। এই মশালটা জ্বাললে কি বনের কি সমুদ্রের সমস্ত হিংস্র জন্তু ভয় পেয়ে পালাবে। আর এই এক হাত লম্বা ছড়ি তোমাদের তরী। তুমি সমুদ্রের যে-কোন জায়গায় এটা রাখবে, সেখানকার জল যতই গভীর হোক না কেন তখনই হেঁটে পার হবার উপযুক্ত হয়ে যাবে, কখনও এ লাঠির উপর জল উঠবে না, তোমার সামনে পেছনে, আশেপাশে জল হাজার গভীর হোক না কেন, এই ছড়ির চারিদিকে চোদ্দ গজ জায়গায় এক হাতের বেশী জল হবে না।' তার পর ফকির মশাল জ্বালিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া তাহাদের সমুদ্রের ধারে পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি নিজ কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজকুমার লাঠি হাতে করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর লাঠিটা জলের উপর রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ চারিদিকে চৌদ্দ গজ জায়গায় জল স্থির হইয়া গেল, তথাকার সমস্ত জল এক হাত মাত্র গভীর হইয়া গেল; কিন্তু সেই মায়াচক্রের বাহিরে সমুদ্রের জল অতলস্পর্শ আর ভীষণ তরঙ্গময়। রাণী তাঁহার পিছনে মশাল হাতে করিয়া চলিয়াছেন, কোথাও তাঁহাদের হাঁটুর উপর জল উঠে না। তাঁহারা সমুদ্রগর্ভের অপূর্ব্ব সব জিনিষ দেখিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে কেহ সে-সব দেখে নাই। কত প্রবাল, মুক্তা, সমুদ্রের নানা রকম ফুল, গাছ প্রভৃতি যে দেখিলেন, তার অন্ত নাই। এই সমস্ত অপরূপ সুন্দর জিনিষ দেখিয়া যে রাজকুমারের কি আনন্দ হইল তা বর্ণনা করা যায় না। যখনই একটা নূতন জীব কিম্বা অন্য কোন জিনিষ চোখে পড়িতেছে তখনই আনন্দে চীৎকার করিয়া মাকে বলিতেছেন, আবার ছুটিয়া গিয়া সেটা তুলিয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখাইতেছেন। তাঁহারা এইরূপে সমুদ্রের নানা রকম বিস্ময়কর জিনিষ দেখিতে দেখিতে আর অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বরের বর্ণনা করিতে করিতে চলিলেন।

যখন সমুদ্রের প্রায় মাঝখানে আসিয়াছেন, তখন রাজকুমার দেখিলেন, এক দিক থেকে একটা জলের স্রোত আসিতেছে, সেই স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উজ্জ্বল মহামূল্য চুনি ভাসিয়া আসিতেছে।

এত উজ্জ্বল চুনি বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মহবুব কখনও চুনি দেখেন নাই, তিনি বালকোচিত আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'মা মা, দেখ কি সুন্দর পাথরগুলি! কি চমৎকার টুকটুকে লাল রঙ! কেমন ঝক-ঝক করছে! মা, আমায় কয়েকটা নিতে দাও না, আমি খেলা করব।'

মা এই পাথরগুলির দাম জানিতেন, সকলের ছোটটিরও বোধ হয় এক লক্ষ টাকা দাম হইবে, তিনি এগুলি ছুঁইতেই ভয় পাইতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, এতগুলি বহুমূল্য আশ্চর্য্য চুনি এমন নির্জ্জন সমুদ্রের মাঝখানে রহিয়াছে, নিশ্চয়ই ইহা শুভ লক্ষণ নহে। নিশ্চয়ই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য শয়তান লোভ দেখাইতেছে। কাজেই তিনি ছেলেকে বলিলেন, 'কেন বাবা, তুমিই তো সকল হীরা-মাণিকের চেয়ে মূল্যবান। তোমার জন্যই আমি এমন জায়গায় এসেছি। এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিও না, শেষে আরও কি বিপদ হবে।' রাজকুমার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু এই চুনিগুলির উজ্জ্বল লাল রঙ তাঁহাকে ক্রমাগতই লোভ দেখাইতেছিল। তিনি পূর্ব্বে কখনও যাহা করেন নাই, তাহাই করিলেন, মায়ের আদেশ শুনিলেন না; লোভ সামলাইতে না পারিয়া রাণীকে লুকাইয়া সকলের বড় একটা পাথর তুলিয়া লইলেন। কখনও কখনও অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। রাজকুমারের এই অবাধ্যতা যদিও তাঁহাকে বিপদে ফেলিয়াছিল, কিন্তু ইহা হইতে পরিশেষে অপ্রত্যাশিত ফল ফলিয়াছিল।

রাজপুত্র ও রাণী ফকিরের লাঠি ও মশালের সাহায্যে বিশেষ কোনও বিপদে না পড়িয়াই এই অগাধ সমুদ্র পার হইলেন। শেষে তাঁহারা ভারতবর্ষের উপকূলে আসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা দেশের রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন। রাজধানী সমুদ্রতীরের বেশী দূরে ছিল না। শহরের বাহিরে একটা সরাইয়ে আশ্রয় লইয়া রাণী রাজকুমারকে কয়েকটা পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিছু খাবার কিনিয়া আনিতে বলিলেন। রাজকুমার কিছু খাবার আনিতে চলিলেন।

রাজকুমার পয়সা হাতে করিয়া এক মিঠাইওয়ালার দোকানে গিয়া হাজির হইলেন। পাছে রাণী তাঁহার লুকাইয়া চুনি আনার কথা জানিতে পারেন, এই ভয়ে সেটা সরাইয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি দোকানীকে বলিলেন, 'ভাই, এই পাথরটা নিয়ে আমায় কিছু খাবার দাও।' দোকানী পাথরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা একটা খুব দামী খাঁটি চুনি। তাহার সেটা খুব ভাল লাগিয়া গেল। সে পাঁচ সের মিঠাই ওজন করিয়া রাজকুমারের কাপড়ের এক দিকে বাঁধিয়া দিল, আর এক দিকে পাঁচ সের খাঁটি সোনার মোহর বাঁধিয়া দিয়া কাপড়টা রাজকুমারকে ফিরাইয়া দিল। মহবুব মিঠাই ও সোনার বোঝা ঘাড়ে করিয়া সরাইয়ে ফিরিয়া আসিয়া সবসুদ্ধ রাণীর সম্মুখে রাখিয়া দিল। এত সোনা দেখিয়া রাণী যে কি-রকম অবাক হইয়া গেলেন তাহা আর কি বলিব; কল্পনা করা তবু সম্ভব। কোন রকম অসৎ উপায়ে আনিয়াছে বলিয়া রাণী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মহবুবকে বলিলেন, 'বাছা, এত মিঠাই, এত সোনা কোথায় পেলে? আমি তো তোমায় মাত্র পাঁচটি পয়সা দিয়েছিলাম; যদি অন্যায় ক'রে এনে থাক তবে এখনি যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এস গিয়ে। অধর্ম্মের থেকে কখনও ভাল হয় না জেনে রেখ।' রাজকুমার মায়ের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, আমি সত্যই অন্যায় করেছি, কিন্তু তুমি যা

মনে করেছ তা নয়। এ দেশের কোন লোকের উপর আমি অন্যায় ব্যবহার করিনি। তোমার কাছেই অন্যায় করেছি। আমি তোমার কথার অবাধ্য হয়ে সমুদ্রের সেই একটা লাল পাথর নিয়ে এসেছিলাম, এইসব মোহর, খাবার তারই বদলে পেয়েছি।' এই কথা শুনিয়া রাণী প্রথমে ছেলের উপর রাগ করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে মিঠাইওয়ালা তাঁহাকে ঠকাইয়াছে, তখন তাঁহার সঙ্গে দোকানে চলিলেন। সেখানে গিয়া দোকানদারকে বলিলেন, 'ভাই, আমার ছেলের যদি চোখ না থাকে, তা বলে কি তুমিও অন্ধ হবে? সে যেন এই পাথরখানার দাম জানে না, তা বলে কি তুমিও জান না যে এর দাম ন' লক্ষ টাকা? এমন ক'রে ছেলেমানুষকে ঠকালে কি বলে?'

মিঠাইওয়ালা ছোট ছেলেকে ঠকাইয়া অন্যায় করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল; কারণ সত্য বলিতে গেলে সে-ই শহরের মধ্যে অন্য সব দোকানদারের চেয়ে সৎ ছিল। সে রাণীর কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিল, 'মা, আমার ভুলচুক মাফ করুন। এই সব লোহার সিন্দুক মোহরে ভরা। এ সমস্ত নিয়ে যান, এতে প্রায় সাত আট লক্ষ টাকার মোহর আছে। আমাকে শুধু এই চুনিটা রাখতে দিন।' রাণী দেখিলেন প্রস্তাবটা নিতান্ত মন্দ নয়, কাজেই সম্মত হইয়া টাকাকড়ি লইয়া সরাইয়ে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে মিঠাইওয়ালা যথেষ্ট লাভ রাখিয়া উজীরের কাছে চুনীটা বিক্রয় করিল, উজীর আবার তার উপর যথেষ্ট লাভ রাখিয়া রাজাকে বিক্রয় করিলেন। রাজা চুনি হাতে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা গুল্‌রুখ্‌কে উপহার দিলেন। রাজকন্যা সেটা গলায় পরিয়া খুব গর্ব্বভরে গাড়ী আনিতে হুকুম করিলেন, তারপর নির্জ্জনে নিজের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য বাগানে চলিয়া গেলেন। মহা আনন্দে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া তিনি একটা আমবাগানে গিয়া বসিলেন।

একটা গাছের ডালে দুটি পাখী বসিয়া ছিল, টিয়া আর ময়না। ময়না টিয়াকে বলিল, 'বন্ধু, একটা ভালরকম গল্প বল, সময়টা তো কাটাতে হবে!' টিয়া বলিল, 'সুন্দরি, আমার গল্প শুনলে তুমি বোধ হয় রেগে যাবে, কারণ আমায় কতকগুলি অপ্রিয় সত্য বলতে হবে।' ময়না বলিল, 'তোমার ভয় নেই, আমি তোমার কথায় রাগ করব না। তুমি তোমার গল্প আরম্ভ কর।' টিয়া বলিল, 'ওগো সুন্দরী, তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের যত রকম অদ্ভুত খেয়াল। এক যে ছিলেন পরমা সুন্দরী সুশীলা রাজকন্যা, তাঁর বাবা একদিন তাঁকে একটা খুব দামী চুনি উপহার দিলেন। রাজকন্যার এমন দামী পাথর কোন জন্মেও ছিল না। তিনি চুনি পেয়ে গর্ব্বে ফুলে উঠলেন। গলায় দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু গরবিনী রাজকন্যা জানতেন না যে তাঁকে একটুও মানাচ্ছিল না, এটা পরতে হলে যে তার উপযুক্ত পোষাকও চাই, তা না হলে যে ধার করা সাজের মত দেখায়, সেদিকে তাঁর দৃষ্টিই ছিল না। যা হোক, রাজকন্যা চুনি পরে, যাতে লোক দেখে, এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, তাঁর ভুল আর ভাঙল না।'

রাজকন্যা পাখীদের গল্প শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকেই ঐসব কথা বলা হইয়াছে; তিনি তখনই প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া চুনিটা ছুঁড়িয়া দিলেন। রাগে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন, অন্ন-জল স্পর্শ করিলেন না; কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। রাজা কন্যার আকস্মিক দুঃখের কথা

শুনিয়া তখনই ছুটিয়া গেলেন, মেয়েকে অনেক আদর করিলেন, 'মা, তোমার কিসের দুঃখ ? অমন ক'রে মাটিতে পড়ে আছ কেন ? কেউ কি তোমায় কিছু বলেছে না কিছু করেছে ? কার উপর রাগ করেছ, কে তোমায় অপমান করেছে, বল। তোমার এত দুঃখের কারণ কি ?' অনেক সাধ্য-সাধনার পর রাজকন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাবা, কেউ আমায় কিছু বলেনি। আমি পৃথিবীর সকল রাজকন্যাদের অপেক্ষা দুর্ভাগিনী। তুমি আমায় ও চুনিটা কেন দিয়েছিলে ? বনের পাখীগুলো পর্য্যন্ত আমাকে ওই নিয়ে ঠাট্টা করে। শুধু ওই চুনিটা পরলে আমায় একেবারেই মানায় না। অমন চুনি পরবার যোগ্য হতে হলে ওর মতন আরও বারোটা মণি চাই, আর তার উপযুক্ত একটা পোষাক চাই। আমায় অমনি পোষাক আর পাথর এনে দাও।' রাজা কন্যার সাধ পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা তখনই উজীরকে তলব করিলেন, এবং কোথা হইতে চুনি আনিয়াছেন খবর লইলেন। উজীর দোকানদারের নাম করিলেন। তাহাকে বলা হইল, যে-পথিকের নিকট সে চুনি পাইয়াছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে তাহার মঙ্গল হইবে না। বেচারা মিঠাইওয়ালা কাঁপিতে কাঁপিতে সেই সরাইয়ে গেল, কিন্তু সেখানে মাতাপুত্রের কোন খোঁজখবর মিলিল না। সমস্ত শহর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া শহরের বাহিরে চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হইল। অবশেষে নিরাশ হইয়া দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় মনে পড়িল, শহরের বাহিরে সমুদ্রের ধারে এক মনোহর জায়গায় কোন এক অজানা বণিক চমৎকার একটি প্রাসাদ করিয়াছে। সেখানে তো খোঁজ লওয়া হয় নাই। তখনই সে সেই প্রাসাদের দিকে ছুটিল।

দরজার কাছে পৌঁছিয়া যেই দরওয়ানদের জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এ কাহার বাড়ী, অমনই দেখিল রাজপুত্র মহবুব এক তেজস্বী ঘোড়ায় চড়িয়া একদল সঙ্গী লইয়া খুব জমকাল পোষাক পরিয়া শিকারে বাহির হইতেছেন। দোকানদার তাঁহাকে পূর্ব্বে দরিদ্র বেশে দেখিয়াছিল, এখন এইরূপ উজ্জ্বল মূল্যবান বেশে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। মস্ত এক সেলাম করিয়া বলিল, 'প্রভু, মহারাজ আপনাকে ডাকিয়াছেন।' রাজকুমার মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, 'যাও, তোমার রাজাকে গিয়া বল আমি তাঁর চাকরও নয় প্রজাও নয়, কিসের জন্য তাঁর হুকুম তামিল করতে যাব ? তাঁর যদি আমার সঙ্গে কোন দরকার থাকে, তিনি এখানে এসে দেখা করলেই পারেন। আমি সর্ব্বদাই বাড়িতে থাকি।'

দোকানদার রাজার কাছে গিয়া বলিল যে, চুনি-বিক্রেতা তাঁহার নিকট আসিবে না, তাঁহাকেই সেখানে যাইতে বলিয়াছে। রাজা যদিও এই কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিলেন, তথাপি মহবুবের নিকট যাওয়া দরকার মনে করিলেন। কারণ রাজকন্যা গুল্‌রুখ্‌ চুনি ও পোষাকের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাঙিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছেন, এখন আর রাগ করিবার সময় নাই। কাজেই রাজা স্বয়ং পারস্যের রাজকুমারের প্রাসাদে চলিলেন। সেখানে তাঁহার খুব ভাল করিয়া অভ্যর্থনা করা হইল। তাঁহাদের পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ভারতবর্ষের রাজা জানিতে পারিলেন যে, গৃহস্বামীও এক রাজবংশের লোক। রাজা অভিবাদনাদির পর আসল কথা পাড়িলেন, 'কুমার, আপনি এক দোকানদারের কাছে যে-রকম একটি চুনি

বিক্রি করেছিলেন, আমি সেই রকম একটা নেবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আপনার কাছে আর আছে কি?' রাজকুমার তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'ওঃ, হাজার হাজার! মহারাজের ক'শ চাই?'

রাজা তো উত্তর শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার এত বড় সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের সমস্ত ধন দিয়াও এমন দশটা পাথর কেনা যায় কিনা সন্দেহ, আর এই নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত যুবক বলে কিনা তাহার হাজার হাজার এমন চুনি আছে! নিশ্চয়ই এই যুবক কারুনের গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছে; কারণ এত ঐশ্বর্য্যশালী কোন রাজা কি সম্রাটের কথা তো এ জীবনে কখনও শোনেন নাই। কাজেই রাজা খুব বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'কুমার, আমার অত চুনি কিনবার ইচ্ছাও নেই ক্ষমতাও নেই; আমার ছটা হলেই চলবে। সেই সঙ্গে এরকম অলঙ্কারের উপযুক্ত একটা পোষাকও চাই।'

রাজকুমার বলিলেন, 'মহারাজ, চার দিনের দিন চুনি আর পোশাক পাবেন। আমায় একবার আমার কোষাগারে যেতে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সেই দিনেই সব পাবেন।' রাজা বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন; এত ধন কোথা হইতে আসে জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন।

এদিকে মহবুব রাণীর নিকট বিদায় লইয়া সহচরদের বলিয়া গেলেন যে, তিনি একটা বিশেষ কাজে যাইতেছেন, চারদিন পরে ফিরিবেন; তারপর সেই মায়াময় মশাল ও লাঠি লইয়া একাকী যাত্রা করিলেন। সমুদ্রের ধারে একটা নির্জ্জন জায়গায় লোকের অসাক্ষাতে মশালটা জ্বালিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে মশাল লইয়া মহবুব খুব দ্রুতবেগে জলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন; এমন নির্ভয়ে চলিলেন, যেন তিনি সমুদ্রেরই অধিবাসী। চারিদিকে কত আশ্চর্য্য জিনিস চোখে পড়িতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি না দিয়া, নিশ্বাস ফেলিবার জন্যও এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া, সমুদ্রের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিলেন। যতক্ষণ না সমুদ্রের মাঝখানে সেই চুনি-পরিপূর্ণ জলস্রোতের নিকট আসিলেন ততক্ষণ একবারও থামিলেন না। তিনি কতকগুলি চুনি তুলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মনে হইল, 'এত চুনি কোথা হতে আসে?' এই রহস্য ভেদ করিতে উৎসুক হইয়া রাজপুত্র উৎসের দিকে চলিলেন। যতই স্রোতের উজান দিকে যান ততই আশ্চর্য্য জিনিস দেখেন। দেখিলেন, স্রোতস্বিনী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার গভীরতা ঠিক করা যাইতেছে না, তাঁহার মায়াময় লাঠি সর্ব্বত্রই জল এক হাত গভীর করিয়া দিতেছে। তিনি ক্রমাগতই চলিয়াছেন। যে স্রোত পূর্ব্বে এক মাইল চওড়া ছিল, এখন তাহা কয়েক হাত মাত্র চওড়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বিস্তৃতির এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্যই যেন সেই জল হইতে একটি অপূর্ব্ব সুগন্ধ উঠিতেছিল। রাজকুমার জীবনে কখনও এমন সুগন্ধ আঘ্রাণ করেন নাই। মনে হইতেছিল যেন হাজার হাজার মণ আতর জলে ভাসিতেছে, আর চারিদিকে তাহার মধুর সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুগন্ধি বাতাসে উৎফুল্ল হইয়া রাজকুমার জলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন, একটা ঘূর্ণি এই নদীর উৎস। ঘূর্ণির জল ফেনাইয়া ফেনাইয়া ভীষণ বেগে ঘুরিতেছে, আবার ফুটিতে ফুটিতে এমন শব্দ করিতেছে যে কান কালা হইয়া যাইবার

যোগাড়। ঠিক যেন হাজার হাজার জল-দৈত্য সমুদ্রের উপর আধিপত্য লাভের জন্য উহার তলদেশে ভীষণ যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়াছে। ঘূর্ণির ভিতর হইতে একটা কয়েক হাত উঁচু ফোয়ারা উঠিয়াছে। তাহার জল খুব স্থির এবং পরিষ্কার, ঘূর্ণির কালো ফুটন্ত জলের ঠিক বিপরীত। ফোয়ারার জল তীব্র মিষ্ট গন্ধ ছড়াইতেছে, আর তাহার সঙ্গে অসংখ্য চুনি পড়িতেছে। জল এমন জোরে উঠিতেছিল যেন কোন এক প্রকাণ্ড দৈত্য প্রবল বেগে পিচকারি দিয়া জল ছুঁড়িতেছে। এক-একবার জলের তোড়ে হাজার হাজার চুনি ফোয়ারা দিয়া উঠিয়া আসিতেছে; চুনিগুলি ফোয়ারার জলের সঙ্গে কিছুক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রাজকুমার ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া ঘূর্ণি, ফোয়ারা ও মণিগুলি দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার অটল সাহস টলিয়া গেল, কিন্তু লাঠিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস টলিল না। মন হইতে সমস্ত সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া তিনি প্রচণ্ড ঘুর্ণির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

তিনি ক্রমাগতই নীচের দিকে চলিয়াছেন, গর্ত্তের ভিতর দিয়া নামিয়াই চলিয়াছেন, তাঁহার উপরে এবং নীচে জল স্থির হইয়া দুই দিকে সরিয়া যাইতেছে। কয়েক মিনিট ধরিয়া তিনি ঘূর্ণির মাঝখানে কুয়োর ভিতর দিয়া নামিয়া চলিলেন, শেষে গিয়া মাটিতে পা ঠেকিল। দেখিলেন, সামনেই গুহার উত্তর দিকে এক প্রকাণ্ড লোহার ফটক। তাহার তলা দিয়া একটা নালা বাহিয়া একটা জলস্রোত আসিতেছে। সেই স্রোতে অসংখ্য চুনি এবং মহামূল্যবান গন্ধদ্রব্য ভাসিয়া আসিতেছে। মহবুব দেখিলেন, দরজা বন্ধ। কাজেই তিনি নালার ভিতর দিয়া ভিতরে ঢুকিলেন। নালাটা মানুষের শরীর ঢুকিবার পক্ষে বেশ বড় ছিল।

ভিতরে ঢুকিবামাত্র দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রাজ্য। দরজাটা দেখিবার জন্য পিছন ফিরিয়া দেখেন, তাহার কোন চিহ্নই নাই। তিনি একটা বাগানে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে কত রকম গাছপালা, কত আশ্চর্য্য রকম পাখী! সামনেই একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ। সাহসে ভর করিয়া প্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন সুন্দর সুন্দর ঘর, নানারকম মহামূল্য সুন্দর গৃহসজ্জায় সজ্জিত; কিন্তু সমস্তই নিস্তব্ধ, প্রাণহীন। তিনি অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া এক ঘর হইতে আর এক ঘরে যাইতে লাগিলেন। শেষে একটা ঘরে আসিলেন, তাহাতে বারোটা সুগন্ধি মোমবাতি জ্বলিতেছে, আর সেই ঘরের কড়িকাঠ হইতে লোহার শিকলে বাঁধা একটা তাজা কাটা মানুষের মাথা ঝুলিতেছে। সেই মাথাটির ঠিক নীচে একটা গামলায় জল রহিয়াছে, আর তাহার চারিদিকে গোল করিয়া সেই বারোটা জ্বলন্ত বাতি সাজান রহিয়াছে। গামলার জলে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে, আর পড়িবামাত্র অনেক উপরে লাফাইয়া উঠিয়া আবার সুন্দর বক্র রেখায় নালায় পড়িতেছে। সেইখানে গিয়া প্রত্যেকটি রক্তের ফোঁটা এক একটি চুনি হইয়া নালা দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রাজকুমার অবাক হইয়া এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া রক্তবিন্দু চুনি হইয়া যাইতেছে। তিনি কতক্ষণ এমনভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন বলা যায় না। অবশেষে প্রায় বারো-তেরো জন লোকের পায়ের শব্দে তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল! রাজকুমার শব্দ শুনিয়া এক কোণে গিয়া লুকাইলেন; পাতালপুরীর

রহস্যময় গৃহে আর কি হয় দেখিতে হইবে।

মহবুব সেইখান হইতে দেখিলেন, অপূর্ব্বমূর্ত্তি বারোটি পরী সেই ঘরে ঢুকিল। তাহাদের মধ্যে একজন সেই মাথাটি নামাইয়া আনিল, আর একজন একটা গুপ্ত স্থান হইতে শরীরটি লইয়া আসিল। তারপর মাথাটি শরীরের সঙ্গে জোড়া দিয়া একটা সোনার খাটে শোয়াইয়া দিল এবং বারোজন পরী বারোটি বাতি তুলিয়া লইয়া মধুর বিষাদমাখা স্বরে গান করিতে করিতে খাটের চারিদিকে বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের গতি দ্রুত হইতে লাগিল ; অবশেষে তাহারা এত জোরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল যে, রাজকুমার তাহাদের আর দেখিতে পাইতেছিলেন না, মনে হইতেছিল বিছানা বেড়িয়া কেবল একটা আলোর মালা রহিয়াছে। রাজকুমার দেখিলেন পরীরা যে গোল পথে ঘুরিতেছে, তাহা বেষ্টন করিয়া একটি ক্ষীণ জলধারা বহিতেছে। তাহার তীব্র মধুর গন্ধে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইতেছিল। তিনি সমুদ্রে যে সুগন্ধ পাইয়াছিলেন তাহা ইহার তুলনায় কিছুই নয়। নৃত্য থামিয়া গেলে রাজকুমার দেখিলেন, পরিশ্রমে পরীদের গা বহিয়া যে ঘাম ঝরিতেছে, সেই ঘামেই ক্ষীণ জলধারার উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ-বালাদের সুগন্ধি ঘামের স্রোত গিয়া নালায় সেই গামলার জলের সঙ্গে মিশিতেছিল। এইরূপে মানুষের রক্তে উৎপন্ন চুনি ও পরীদের সুগন্ধি ঘাম সেই রহস্যময় প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছিল।

তারপর পরীরা খাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রত্যেকে মৃত লোকটির মুখ চুম্বন করিয়া করুণ বিলাপ আরম্ভ করিল, 'আর কতদিন ; প্রভু, আর কতদিন ? এই চৌদ্দ বৎসর ধরে দিন-রাত্রি অপেক্ষা করছি। ওগো, কবে আমাদের নিরাশার অন্ধকারে আশার সূর্য্যের উদয় হবে ? মহারাজ, জাগ, জাগ, আর কতদিন এই কালনিদ্রায় অচেতন থাকবে ?' এইরূপে তাহারা বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা।

হঠাৎ সুমধুর আনন্দময় সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। রাজপুত্র এবং পরীগণ সকলেই এই অপূর্ব্ব ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গীতধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। পরীরা স্বর্গীয় গন্ধর্ব্ব কিন্নরদের স্বর চিনিতে পারিয়া আশা, আনন্দ ও সন্দেহে পুলকিত হইয়া উঠিল, আর রাজপুত্র মনোহর স্বরলহরী শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর ঘরের মেঝে ভেদ করিয়া পারস্য দেশের মসজিদের সেই ফকিরের মূর্ত্তি উঠিয়া আসিল। তিনি এখন আলোক-নির্ম্মিত বেশে সজ্জিত। পরীরা সকলে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'খাজা খিজির, খাজা খিজির, সময় হয়েছে নাকি ?'

এই ফকিরই খাজা খিজির। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'হাঁ সময় হয়েছে, আর তোমাদের কাঁদতে হবে না।' তার পর মহবুব যেখানে লুকাইয়াছিলেন, সেই দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'রাজকুমার, বেরিয়ে এস।' রাজপুত্র তখনই বাহির হইয়া আসিয়া মহান অমর পুরুষ খাজা খিজিরকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বদর্শী সাধুপুরুষ বলিতে লাগিলেন, 'কুমার, এই দেখ তোমার সম্মুখে তোমার পিতার

মৃতদেহ। কাসব তাঁকে হত্যা করবামাত্র পরীরা তাঁর দেহ পারস্যের রাজাদের সমাধিস্থল এই পাতালপুরীর প্রাসাদে নিয়ে এসেছে। তোমার পূর্ব্বপুরুষরা "মেগাই" বংশজাত ছিলেন, তাঁরা জ্ঞানবলে পরীদের ও দৈত্যদের উপর প্রভুত্ব করতেন। এই বংশের কারও মৃত্যু হলে এই অগ্নি-ও আকাশ-বিহারী বিশ্বাসী জাতিরা তাঁর মৃতদেহ এনে এইখানে সমাধিস্থ করে। কিন্তু তোমার পিতার দেহ এখনও সমাধিস্থ করা হয়নি, কারণ এখনও কেউ তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করেনি। ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে ফেলেছে। তাঁর অস্থির আত্মাকে শান্তি দেবার জন্যে যে সকল ক্রিয়া করতে হবে তা কর।'

রাজকুমার এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন এবং মৃতদেহের কাছে গিয়া আল্লার নিকট স্বর্গীয় রাজার আত্মার কল্যাণের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনা শেষ করিয়া তিনি যেই পিতার দেহের উপর হাত দিলেন, কি আশ্চর্য্য! অমনই আবার সেই অদৃশ্য স্থান হইতে সঙ্গীত-লহরী ধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনই রাজার মাথা ও শরীর জোড়া লাগিয়া গেল এবং পারস্যের রাজা পুত্রের স্পর্শে জীবন পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন পরীদের আনন্দ দেখে কে? খাজা খিজির পিতা ও পুত্রের পরিচয় করিয়া দিলেন, এবং পরীদের রাজ্যে উৎসব আরম্ভ হইল। তার পর সেই সাধুপুরুষ যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন তেমনি করিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন, এবং পরীগণ ও দৈত্যরা পারস্যের রাজা ও তাঁহার পুত্রকে ভারতবর্ষে মহবুবের প্রাসাদে রাখিয়া আসিল। চক্ষের জলে রাজা ও রাণীর মিলন হইল; সে দৃশ্য বর্ণনা করা অপেক্ষা কল্পনা করাই সোজা।

এদিকে চার দিন উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর ভারতবর্ষের রাজা চুনির জন্য মহবুবের প্রাসাদে আসিলেন। শিংওয়ালা অদ্ভুত জীবদের দরজায় পাহারা দিতে দেখিয়া রাজা তো ভয়ে-বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে প্রবেশলাভ করিলেন। দরবার-গৃহে রাজা মনসূর-ই-আলম ও রাজকুমার মহবুব বসিয়া ছিলেন। মহবুব তাঁহাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আগ্রহের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভুলে যাইনি। আপনার আদেশ পালন করতে গিয়ে আমি যে সুখের অধিকারী হয়েছি, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আর চুনি আপনি যত চান, তত পাবেন।' এই বলিয়া তিনি এক ভৃত্যকে একবাটি জল আনিতে বলিলেন। জল আনা হইলে একটা আঙুলে ছুঁচ ফুটাইয়া বাটির জলে দশ-বারো ফোঁটা রক্ত ফেলিলেন, আর তখনই সেগুলি চুনির মত জ্বলিয়া উঠিল। ভারতবর্ষের রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। তখন রাজকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'মহারাজ, জেনে রাখুন যে পারস্যের রাজা ও রাজকুমারগণের এক এক বিন্দু রক্ত শত শত চুনি অপেক্ষা মূল্যবান, আর তাদের এক ফোঁটা চোখের জল হাজার হাজার মুক্তা অপেক্ষা মূল্যবান। আমি এ রহস্য আমার পিতা এই মহারাজের কাছে জেনেছি।' ভারতবর্ষের রাজা মহাশক্তিশালী পারস্যের রাজার সম্মুখে রহিয়াছেন জানিবামাত্রই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

বাকী গল্পটা খুব শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলা যায়। রাজকুমারী গুলরুখ চুনি ও পোষাক পাইলেন। এবার টিয়া ও ময়না তাঁহার খুব প্রশংসা করিল, এবং যে রাজকুমার তাঁহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার

করিয়াছেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিল। পরামর্শ টা তাঁহার মনের মতনই হইয়াছিল, এবং ভারতবর্ষ ও পারস্যের রাজাদেরও ইহাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। কাজেই বিবাহ-ব্যাপারে আর কোনও বাধা পড়িল না। ভারতবর্ষের রাজা একটা মস্ত সৈন্যদল অস্ত্রশস্ত্রে সাজাইয়া আনিলেন, আর পরীগণ ও দৈত্যেরা আর এক দল ছিল। তখন তাঁহারা সকলে পারস্যের দিকে যাত্রা করিলেন। কাসবের অত্যাচারে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্য আক্রমণ করিতে সৈন্যদল আসিতেছে শুনিয়া কাসব টাকা দিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্য সংগ্রহ এবং কিছুক্ষণ বৃথা যুদ্ধ করিয়া হত হইল। পরীরা তাহার মাথা ও শরীর পারস্যের রাজাদের সমাধিস্থল সেই মাটির নীচের ঘরে লইয়া গেল, আর পূর্ব্বে যেখানে রাজার মাথা ঝুলান ছিল, ঠিক সেইখানে তাহার মাথাটা ঝুলাইয়া দিল। গামলার জলে এক ফোঁটা করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, আর বিকটমূর্তি এক-একটা ব্যাঙ হইয়া অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত বিষ ও দুর্গন্ধ ছড়াইতে ছড়াইতে সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।

—শেষ—

